মুক্তিযুদ্ধে যশোর
আসাদুজ্জামান আসাদ

প্রকাশক
ইউনিয়ন পাবলিশার্স
১৫২ শান্তিনগর ঢাকা
প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
মুদ্রণ
ষ্টান্ডার্ড প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
দশদিশা কম্পিউটার ঢাকা
প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক
ছবি
মোহাম্মদ শফি

দাম ৮০ টাকা

পরিবেশক আগামী প্রকাশনী
৩৬, বাংলা বাজার ঢাকা

উৎসর্গ

ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর
ডঃ কামাল সিদ্দিকী
কাজী গোলাম রহমান

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বৃটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলেও বাংলাদেশ মূলত পরাধীনই থেকে যায়। সাতচল্লিশের কথিত স্বাধীনতা কালে (বাংলা ভাগ) বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হলেও বাংগালীর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন আদৌ সম্ভব হয়নি। অবাঙ্গালী পাকিস্তানীদের সংগে বাঙালীদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি আর ভৌগলিক ব্যবধান এবং সেই সাথে তাদের চরম বৈষম্যমূলক শাসনই বাঙ্গালীদের স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়।
আটচল্লিশ সাল থেকেই পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা সোচ্চার হয়ে উঠে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনাবলীর মাধ্যমে বাঙ্গালীদের মনে স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙ্গালীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও দেশ শাসনের অধিকার পেলনা এবং এ সময় বাঙ্গালীদের দমিয়ে রাখার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে উঠে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী।
আইয়ুব ইয়াহিয়া আর ভূট্টোর ত্রিপক্ষীয় গোপন ষড়যন্ত্রকে মদদ দেয় পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা দস্যুরা। ২৫ মার্চ '৭১ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র দেশের উপর ঝাপিয়ে পড়ে পাকিস্তানী হায়েনারা। লেলিহান থাবা বিস্তার করে তারা বীভৎস এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞের উল্লাসে মেতে ওঠে। সাড়ে সাত কোট বাঙ্গালীর জীবনে নেমে আসা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ধ্বংসজ্ঞ আর ভয়াবহ তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করে সমগ্র বিশ্ববাসী। ফলে বাঙ্গালীদের জীবনে স্বাধীনতার প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে।
১৯৭১ সালে সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাঙ্গালীরা প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংগঠিত সমগ্র মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতা আর রাশিয়ার সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করে। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিরোধিতা এবং সেই সাথে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ও এদেশের বসবাসকারী বিহারীদের সহযোগিতায় গড়ে উঠা রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনীর পৈশাচিকতা মধ্যযুগের বর্বরতার চেয়েও ছিল ভয়ংকর। তাদের

নিষ্ঠুরতা গেষ্টাপো বাহিনীর হত্যা যজ্ঞের কাহিনীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তার এদেশীয় সহযোগীদের হাতে শহীদ হয়েছিল ত্রিশ লাখ বাঙ্গালী, ধর্ষিতা হয়েছিল কয়েক লাখ মা-বোন। মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার পাশাপাশি তারা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল রাস্তাঘাট, কলকারখানা। আগুনের লেলিহান শিখায় প্রজ্জলিত করেছিল এদেশের ব্যাপক জনবসতি। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের সোনালী সন্তানেরা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ছিনিয়ে এনেছিল এ দেশের রক্তে রাঙানো সবুজ পতাকা। বাঙ্গালীর জীবনে অনিবার্য হয়ে ওঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে। তবে তার আগ থেকে সারাদেশে তার প্রাথমিক আয়োজন চলতে থাকে। দেশব্যাপি সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিজয় স্বত্বেও যখন ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে নানা অজুহাত ও ষড়যন্ত্র তখন থেকেই এদেশের মানুষ একটি অনিবার্য সংঘাতের আশংকা করতে থাকে। ফলে তারাও মনে প্রাণে সেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৈরী হতে থাকে। সেই প্রক্রিয়ায় সারা দেশের মত যশোরের সংগ্রামী মানুষ ও পিছিয়ে ছিল না। বঙ্গবন্ধুর আহবানে যেকোন অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল নড়াইল, ঝিনেদা, মাগুরাসহ বৃহত্তর যশোরের ৪০ লাখ মানুষ।

যশোরে সর্বদলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ৩মার্চ। এদিন শহরের ঈদগা ময়দানে অনুষ্ঠিত সেই সমাবেশে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়। নেতৃবৃন্দ তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি এবং অনিশ্চিত আগামীর জন্য তৈরী হতে বলেন। এদিনের সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিশাল মিছিল যখন শহর প্রদক্ষিণ করছিলো তখন সেনাবাহিনী মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। মিছিলে প্রথম গুলি ছোড়া হয় রেলরোডে। এতে মিছিল আরো জঙ্গী আকার ধারণ করে যখন টেলিফোন ভবনের নিকটে আসে তখন পুনরায় মিছিলে গুলি করা হয়। নিহত হন চারুকলা নামে একজন কর্মী। এখবর তীব্রবেগে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ আরো অগ্নিমুখী হয়ে উঠে। প্রায় বিশ হাজার মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে লক্ষ জনতার জনসমূদ্রে পরিণত হয়। চারুবালার লাশ নিয়ে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। এদিন মিছিলের নেতৃত্বদেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মশিউর রহমান, মোশারফ হোসেন, রওশন আলীসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।

৩ মার্চ অনুষ্ঠিত এই সর্বদলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠানের একদিন আগে অর্থাৎ ২ মার্চ যশোরে "স্বাধীন বাংলার পতাকা" উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন কর্মসূচীতে যারা সেদিন সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা খান টিপু সুলতান। শেখ রবিউল আলম, আব্দুল হাই, আলী হোসেন মনি, অশোক রায়, শেখ আব্দুস সালাম, আশরাফ চৌধুরী, রওশন জাহান সাথী সহ আরো অনেকে। পতাকা তৈরীতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মাহমুদ উলহক, সৈয়দ মহব্বত আলী, অমলবোস ও আব্দুস সালাম। পতাকা উত্তোলন করেন আবদুল হাই।

৭ মার্চ যখন ঢাকার তৎকালীন রেস কোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তখন যশোর ঝিনেদা, মাগুরা ও নড়াইল শহরে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয় সর্বশেষ নির্দেশ শোনার জন্য। কিন্তু সেদিন পাক দস্যুরা বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ (যুদ্ধজয়ের গান) প্রচার হতে দেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারাদেশে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই ঘোষণা ছড়িয়ে যায়। মিছিল চলতে থাকে সারারাত। সেই সঙ্গে নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক প্রস্তুতি। ৮ মার্চ সকালে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারিত হলে সারা শহরে বাধভাঙ্গা জোয়ারের মত মানুষ বেরিয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী শহরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।
স্থানীয়ভাবে গঠিত হয় "সংগ্রাম পরিষদ" স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। সকল ক্ষেত্রেই সে সময় যারা শীর্ষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন, মশিউর রহমান, রওশন আলী, মোশাররফ হোসেন, নুরুল ইসলাম, আব্দুস শহিদ লাল, খান টিপু সুলতান, রবিউল আলম, খয়রাত হোসেন, আব্দুল হাই, ছালেহা বেগম, হায়দার গণি খান পলাশ, শেখ আব্দুস ছালাম, আব্দুল মান্নান, আলী হোসেন মনি, এস,এম, জামাল উদ্দিন, জালাল উদ্দিন, নজরুল ইসলাম ঝরনা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
যশোর জেলার সর্বত্র নেতৃবৃন্দ ওয়ার্ড পর্যায় থেকে কমিটি গঠন করে তাকে জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এসব কমিটির কাজ ছিল জনতাকে সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। প্রধান দুটি ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয় এম এম কলেজ ও শহরের উপকন্ঠে শংকর পুরে। এসব ট্রেনিং সেন্টার প্রশিকণের জন্য প্রথম দিকে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ইপি আরও পুলিশ বাহিনী ২৫ মার্চ আক্রমণের পূর্বে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিপায়।
যশোরে দেশের একটি প্রধান সেনানিবাস থাকায় আন্দোলনের গুরুত্ব ও ছিল এখানে অধিক। মার্চের মাঝামাঝি থেকে ছাত্রজনতা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতায় ক্যান্টনমেন্টে খাদ্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ২৩ মার্চ নিয়াজ পার্কে অনুষ্ঠিত হয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র যুবক জনতার (মুক্তিযোদ্ধাদের) প্রথম কুচকাওয়াজ। ২৪ মার্চ যশোর শহর এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও মানুষ এসে মিছিলে শরীক হয় এবং পরবর্তী করণীয় কি তা জানার জন্য নেতৃবৃন্দের বাড়িতে ভীড় জমাতে থাকে। এসময় সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য ও ছাত্র যুবকদের একটি বাহিনী প্রস্তুতি নিতে থাকে। এরা যশোর সেনানিবাসের কয়েকদিকে পরিখা খনন করে সেখানে অবস্থান নেয়। উদ্দেশ্য সেনাবাহিনী যদি ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসে তখনই আঘাত হানা।
২৫ মার্চ গভীর রাতে সেনাবাহিনীর একটি বিশাল বহর শহরের দিকে অগ্রসর হয়। শহরের উপকন্ঠে খয়ের তলা ও অরিফ পুরে মুক্তিবাহিনী প্রথম তাদের প্রতিরোধ করে। অসম সাহসী কিন্তু অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্রধারী পাকিস্তানী হানাদার দস্যুবাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পাক সেনারা বেপরোয়াভাবে গুলি ছুড়তে ছুঁড়তে শহরে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাড়ি এবং কলেজ ছাত্রাবাসগুলোতে প্রথম আঘাত হানে। শহরের নিয়ন্ত্রণগ্রহণ করে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযান চালায়। প্রথম রাতেই পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতারহন জনাব মশিউর রহমান, মইনুদ্দিন মিয়াজি, সুধীর ঘোষ সহ অনেকে। ২৮ মার্চ জনতা পুনরায় আরেকটি প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনীও ইপিআর বাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা সৈনিকগণ অংশগ্রহণ করে। যশোর ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যরা ২৯ মার্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন লেঃ আনোয়ার ও ক্যাপ্টেন হাফিজ। এই যুদ্ধে কয়েকশ' বাঙ্গালী

সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকে অস্ত্র সহ বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।
৩১ মার্চ যশোর সেনানিবাস দখলের জন্য নড়াইল থেকে প্রায় ২৫ হাজার জনতার এক বিশাল জঙ্গী মিছিল যশোরে আসে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত এই গণবাহিনী প্রথমেই শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ইপিআর ক্যাম্পে আক্রমণ করে এবং ইপিআর বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর তারা মুখোমুখি হয় ঝুমঝুমপুরস্থ বিহারীদের। এই ক্যাম্পে বসবাসরত হাজার হাজার বিহারী সরাসরি মিছিলের মুখোমুখি হলে তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। সেনা নিবাসমুখী জনসমুদ্র দ্বিতীয় দফায় জয়ী হয়। এখানে উভয় পক্ষের অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। এরপর তৃতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয় যশোর কারাগারে। যেখানে জেলখানা ভেঙ্গে সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ে জনতার ক্যান্টনমেন্ট প্রতিরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রবল প্রতিরোধ গড়ে জনতা ২ এপ্রিল পর্যন্ত টিকে থাকে। কিন্তু ৩ তারিখের মধ্যে সকল প্রতিরোধ বুহ্য ভেঙ্গে পড়ে। জনতা পরবর্তী যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করে।
মার্চের প্রথম থেকেই নড়াইলের সর্বত্র সংগ্রামী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর তারা চুড়ান্ত অসহযোগ চালিয়ে যায় এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার আব্দুল হাফিজ, লেঃ মতিউর রহমান, এখলাস উদ্দিন আহমেদ, শাহেদ আলী খান, বজলুর রহমান, শরিফ আব্দুল হাকিম, ওলিউর রহমান, খান আব্দুল হাই, গাজী আলী করিম, শরীফ খাসরুজ্জামান, স, ম, আনোয়ারুজ্জামান, আব্দুস ছালাম, আবুল কালাম আজাদ, ওয়াহিদুর রহমান, দেলোয়ার হোসেন, নূর মোহাম্মদ মিয়া সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান জিন্নাহকে আহবায়ক করে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম কমিটিতে ছিলেন সাইফুর রহমান, খায়রুজ্জামান, শরীফ হুমায়ুন কবীর আঃ হামিদ, সিদ্দিক আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ৭ মার্চের ভাষণ সেদিন রেডিওতে প্রচারিত না হওয়ায় নড়াইলের নেতৃবৃন্দ টেলিফোনের মাধ্যমে তা জানতে পারেন যশোর থেকে জনাব মশিউর রহমানের মাধ্যমে। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ৮ মার্চ গ্রাম গ্রামান্তর থেকে হজার হাজার মানুষ দা, শড়কি, বল্লাম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে শহরে সমবেত হয়। এ সময় নেতৃবৃন্দ সকল ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সংগ্রাম কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর পাশাপাশি সেনা, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের দিয়ে ছাত্র–যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। সময় যতই গড়াতে থাকে ততই মিছিল মিটিং এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করে। ২৩ মার্চ ছাত্র জনতা মহকুমা প্রশাসকের দফতরের পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা তোলেন। মহকুমা প্রশাসক ডঃ কামাল সিদ্দিকী এসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং অন্যতম সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মহকুমা প্রশাসকের দফতর হয়ে উঠে সংগ্রাম কমিটির কেন্দ্রবিন্দু।
২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে হানাদার বাহিনীর আগমন প্রতিহত করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এসময় নেতৃবৃন্দ নড়াইল অস্ত্রগারের তালা ভেঙ্গে প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন।

লোহাগড়া হাইস্কুল মাঠে স্থাপিত হয় প্রধান মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ইতনা হাইস্কুল মাঠেও গড়ে তোলা হয় প্রশিক্ষণ শিবির। এছাড়া দিঘলিয়া, কালিয়া, মোল্লাডাঙ্গা, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানেও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। বিভিন্ন ক্যাম্পে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন লুৎফর রহমান বিশ্বাস, আবুল কালাম আজাদ, শামসুর রহমান, আমীর হোসেন সহ আরো অনেকে। পাক হানাদার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬ এপ্রিল নড়াইলের ওপর বোমা বর্ষণ এবং গানবোট থেকে গুলি বর্ষণ করে। এসময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং নেতৃবৃন্দেরা লোহাগড়ায় গিয়ে সংগঠিত হন। ১৩ এপ্রিল পাক দস্যুবাহিনী নড়াইল দখল করে নেয় এবং প্রথম দিনেই ১০জনকে দাড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এরপর শুরু হয় জেলার জামাতকর্মী ও মুসলিম লীগের সহযোগিতায় জ্বালাও পোড়াও অভিযান। জেলার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ তখন ভারতে চলে যান এবং অনেকে এলাকায় থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

বৃহত্তর যশোরের অন্যান্য অঞ্চলের মত মাগুরাতেও মার্চের শুরু থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিপায়। এখানে প্রথমেই স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে এ্যাকশান কমিটি যার নেতৃত্বদেন রেজাউল হক, শরীফ আমিরুল হাসান, শামসুর রহমান, গোলাম আম্বিয়া, আবু নাসের বাবলু, রোস্তম আলী সহ আরো অনেকে। ৩ মার্চে মাগুরা নোমানী ময়দানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় বাংলাদেশের পতাকা তোলেন রেজাউল হক।

৭ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর জনসভার খবর মাগুরার নেতৃবৃন্দ প্রথম শুনতে পান, টেলিফোনের মাধ্যমে। পরদিন ৮ মার্চ রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি শুনতে পান সর্বস্তরের মানুষ। জনতা এসময় তীব্ররোষে ফেটে পড়ে। এবং পরবর্তী করণীয় কি এজন্য জেলা নেতৃবৃন্দের বাসভবন এবং আওয়ামী লীগ অফিসে সমবেত হতে থাকে। ৮ মার্চ গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। কমিটিতে ছিলেন আসাদুজ্জামন, আবু মিয়া, বেবি সিদ্দিকী, বেনু মিয়াম, তৈয়বুর রহমান, আকবর হোসেন, আবদুল মাজেদ, আলতাফ হোসেন, জলিল সর্দার, আফসার উদ্দিন, আবুল ফাত্তাহ, আবুল খায়ের প্রমূখ ব্যক্তি।

এ্যাডঃ আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম কমিটিতে উপদেষ্টা ছিলেন সোহরাব হোসেন, সৈয়দ আতর আলী। মহকুমা প্রশাসক ওয়ালিউল ইসলাম এসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সংগ্রাম কমিটির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় নোমানী ময়দানে। এছাড়া শ্রীপুর মোহাম্মদপুর প্রভৃতি স্থানেও প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয়। এসকল স্থানে নেতৃত্ব দেন আব্দুর রশীদ বিশ্বাস, আব্দুল কাইয়ুম মিয়া, নজির মিয়া, নজরুল ইসলাম, আতিয়ার রহমান, গোলাম রব্বানী, নবুয়াত আলী, আকবর হোসেন মিয়া, সুজায়েত আলী, ফয়জুর রহমানসহ আরো অনেকে। ছুটিতে আসা এবং অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকেরাও সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে কাজ করেন। এদের সহযোগিতায় ব্যাপক ভিত্তিতে শুরু হয় যুদ্ধ ট্রেনিং। ছাত্র জনতার প্রবল চাপের মুখে এসময় মহকুমা পুলিশ প্রধান অস্ত্র দিতে বাধ্য হন। প্রাথমিকবাবে মুক্তিযোদ্ধাদের মাগুরা শহর রক্ষার জন্য কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কামারখালী, লাঙ্গলবাধ, সিমাখালী সহ আরো কয়েকটি স্থানে যোদ্ধারা বাংকার খুড়ে অবস্থান নেয়। মাগুরায় সর্বস্তরের মানুষ তখন সংগ্রাম কমিটি ও যোদ্ধাদের জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে অর্থ

সাহায্য দিতে থাকে। এপ্রিলের শেষভাগে পাক সেনারা মাগুরায় প্রবেশ করে। এসময় মুক্তিযোদ্ধারা দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামান্য অস্ত্রের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করে ব্যর্থ হয়। সংগ্রাম কমিটি নেতৃবৃন্দ যোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পুনরায় সংগঠিত হতে থাকে।

সারাদেশের মত মার্চের শুরু থেকেই ঝিনেদাতে বিদোহের আগুন জ্বলে উঠে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর টালবাহানা ও বাঙ্গালীদের দাবিয়ে রাখার ২৩ বছরের পুঞ্জিভূত ক্রোধ ঝিনেদার জনগণের মনে ৭ মার্চ থেকে বারুদের মত জ্বলে উঠে। এরও আগে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঝিনেদা সফরে আসেন। মূলত তখন থেকেই এখানাকার মানুষের মনে আন্দোলনের আপোষহীন মনোভাব গড়ে উঠে। শুরু হয় আসন্ন যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ কর্মসূচী। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটি সমুহের বিস্তৃতি ঘটে শৈলকুপা, হরিনাকুন্ড, কালিগঞ্জ, কোট চাঁদপুর, মহেশপুর থানা সমূহে। ব্যাপক মিছিল মিটিং এর পাশাপাশি চলতে থাকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্রযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণ শিবিরে কেবল ছাত্র যুবকরাই নয় তাতে অংশ গ্রহণ করে ৭০ বছরের বয়স্ক ব্যক্তিরাও।

২ মার্চ ঝিনেদাতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। এর আগের দিন অর্থাৎ ১ মার্চ ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচারী সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের মানুষ। ৩ মার্চ ঝিনেদাতে প্রায় ১ লাখ মানুষের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে সেদিন স্বাধীনতার পতাকা তোলেন ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুল হাই। ছাত্র সংগ্রাম কমিটিতে যারা বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন সিদ্দিক আহমেদ, শহিদুল আলম বকুল, জহিরউদ্দিন, মনোয়ার হোসেন, নজরুল ইসলাম, মকবুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আব্দুস ছামাদ, আলিমুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আমীর হোসেন, নায়েব আলী, রফিক দাদ, নূরুজ্জামান চৌধুরী, আব্দুর রহমান, সেকেন্দার আলী, খায়রুল কবীর ও রহমত আলী প্রমুখ।

মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত জনতার শ্লোগান ছিল বীর বাঙ্গালী অস্ত্রধর বাংলাদেশের স্বাধীন কর, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ শেখ শেখ মুজিব, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবং জয়বাংলা। ১১ মার্চ ঝিনেদাতে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি এবং এর আহবায়ক নিযুক্ত হন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল আজীজ। কমিটিতে অন্যান্য যারা মূখ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন গোলাম মজিদ, নূরুন্নবী সিদ্দিকী মাহবুব, উদ্দিন ও আব্দুল মতিন। সংগ্রাম কমিটির কর্মকান্ডের সুবিধার জন্য বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করেন। এসবের মধ্যে ছিল খাদ্য সরবরাহ, যোগাযোগ, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক কমিটি প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে বলিষ্ট ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে ছিলেন মইন উদ্দীন মিয়াজী, আব্দুল জলিল, গোলাম মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, মইনউদ্দিন আহমেদ, ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, ইয়াহিয়া মোল্লা, নূরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, মোশাররফ হোসেন, নূরুল ইসলাম খান, মতিয়ার রহমান, আবুল গফুর, সাজেদুর রহমান, আফজাল হোসেন, তোফাজ্জেল মিয়া, মোজাম্মেল হক, লেবু মিয়া, সুশীল বসু, খন্দকার আবু সাঈদ, দেবাশীস বিশ্বাস, ওমেদুল ইসলাম, আব্দুল করিম, শফিউর রহমান, জোয়াদ আলী, খোরশেদ মোল্লা,

আব্দুস সোবহান, আজহার বিশ্বাস, মতলেব কাজী, মোশাররফ আলী, আব্দুল জলিল, আব্দুল করিম, লুৎফর রহমান কাজী খাদেমুল ইসলামসহ আরো অনেকে। ২৫ মার্চ রাতে অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির জরুরী সভা। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় জনতা জেলা অস্ত্রাগার ভেঙ্গে প্রায় পাঁচশ রাইফেল, বন্দুক ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেন। এই প্রক্রিয়ায় জনতা জেলার ৬টি থানা থেকেও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেন। গঠিত হয় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ। জেলার পুলিশ প্রধান মাহবুব উদ্দিন ও অধ্যাপক আব্দুল হালিম স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাদের নেতৃত্বে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে বাংকার খোড়া এবং ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসক লেফাউর রহমান ও ক্যাডেট কলেজ অধ্যক্ষ এম রহমান সহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও এ সংগ্রামের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করেন। জেলার কেসি কলেজ, থানা পরিষদ সহ আরো কয়েকটি স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরী করে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোক দিয়ে শুরু হয় ব্যাপকভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। রাইফেল ও বন্দুকের স্বল্পতার কারণে টেনিং এর জন্য বাঁশের লাঠি ও কাঠের ডামি রাইফেল ব্যবহৃত হয়। সমগ্র দেশের মত বৃহত্তর যশোরের জনগণ প্রস্তুতি নেয় একটি সর্বাত্মক স্বাধীনতা যুদ্ধের।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট পাঞ্জাবী সৈন্য ছিল তিন হাজার। বাঙ্গালী সৈন্য প্রায় তের'শ। ক্যান্টনমেন্টটি শহর থেকে ১ মাইল পশ্চিমে। বাঙ্গালী সৈন্যদের অর্ধেকের বেশি অংশকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু দূরে জগদীশপুর অঞ্চলে আলাদা একটি ক্যাম্পে রাখা হয়। এই ক্যাম্পটিকে বলা হয় স্কীম নং ১। চলতি কথায় ইপিজার ক্যাম্প।
২৭ মার্চ ক্যান্টনমেন্টে ডেকে পাঠানো হল ইপিআর ক্যাম্পের সৈন্যদের। তারা জগদীশপুর থেকে সেখানে পৌঁছানো মাত্র পাঞ্জাবী ব্রিগেডিয়ার তাদের হুকুম দিল সমস্ত রাইফেল ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্রাগারে জমা দিতে। তাঁদের কাছ থেকে ইপিআর ক্যাম্পের অস্ত্রাগারের চাবিও কেড়ে নেয়া হল। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হল তাদের। অর্থাৎ এক জায়গাতেই জড়ো হল ১,৩০০ বাঙ্গালী সৈন্য। মাঝ রাতে হঠাৎ এই সৈন্যদল একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রাগারের উপর। তালা ভেঙ্গে উদ্ধার করল প্রচুর চীনা স্বয়ংক্রীয় রাইফেল, কয়েকটি মেশিনগান, অসংখ্য বুলেট, অনেকগুলি পিস্তল, ডিনামাইট স্টিক ও চার্জার। পাঞ্জাবী সৈন্যরা বিপুলভাবে সংখ্যাধিক্য হলেও অপ্রস্তুত ছিল। এর পরই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে রক্তাক্ত লড়াইল শুরু হয়ে গেল দু-দলের। মাঝ রাতে অতর্কিতে গুলী চালনার শব্দে জেগে উঠল সারা যশোর শহর। ক্যান্টনমেন্টের প্রাংগণ বহু নিহত সৈনিকের লাশে ভরে উঠল। তার মধ্যে দরজা ভেঙ্গে এক হাজারের ওপর বাঙ্গালী সৈন্য বেরিয়ে এলেন রাস্তায়, কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র সমেত ছুটলেন জগদীশপুর ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পে প্রবেশ করেই তারা ক্যাম্পের সুপারভাইজার তিনজন পাঞ্জাবী সুবেদারকে গ্রেপ্তার করে ওখানকার অস্ত্রাগার ভেঙ্গে যা ছিল সবই ছিনিয়ে নিলেন। ইপিআর বাহিনী শহরাঞ্চল

ছেড়ে অবস্থান নিল আঠার মাইল দূরে কোট চাঁদপুর। হাজার হাজার জনতা ভিড় করে তাদের দেখতে এলো। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ-এর লড়াইয়ে জনসাধারণের সমর্থন চাইলেন ও যার কাছে যা অস্ত্র আছে স্থানীয় থানায় জমা দিতে বললেন। অবিস্মরণীয় দ্রুততার সঙ্গে চারটি স্তরে তৈরি হল মুক্তিফৌজ-ইপিআর বা সামরিক বাহিনী, মুজাহিদ বা আধা-সামরিক বাহিনী, আনসার অর্থাৎ রাইফেল ট্রেনিং প্রাপ্ত নাগরিকবৃন্দ এবং যোগাযোগ ও সরবরাহকারী স্বেচ্ছাসেবক দল।
২৯ মার্চ যশোর হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভ ফোর্স বাহিনী মুক্তিসেনাদের সঙ্গে যোগ দিল। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য জমায়েত হলো প্রতিটি যুবক। ৩২৫ জন মুজাহিদের একটি বাহিনী চৌগাছা অঞ্চলে চৌকি দিতে চলে গেল। ইপিআর এর দখলে কিছু জিপ ও ট্রাক ছিল, অন্যান্য বেসামরিক গাড়িগুলি অস্থায়ীভাবে মুক্তিফৌজের আওতায় আনা হল। যশোর ক্যান্টনমেন্টে যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ছিল, তাদের যদিও বলা হত ২৫ বালুচ রেজিমেন্ট, কিন্তু তারা সবাই ছিল পাঞ্জাবী সৈন্য। এদের মধ্যে আছে ইনফ্যান্ট্রি ওয়ার্কসপ কর্মী, আর্টিলারি বাহিনী, ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ, ওয়্যারলেস ও সিগন্যাল বাহিনী। ইতিমধ্যে তারা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে শহরে ঢুকে পড়েছিল এবং দৌলতপুরে একটি সামরিক ঘাঁটি বসিয়েছিল। এই ঘাঁটির এপারে মুক্তিফৌজ ও স্থানীয় জনতা ২৯ মার্চ বিকেলে সমবেতভাবে আক্রমণ চালায় এতে দৌলতপুর ও শহরাঞ্চল ছেড়ে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে পালিয়ে যায়। পিছিয়ে যাওয়ার সময় তারা মুক্তিসেনাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ঘায়েল করে।
৩০ মার্চ সকাল থেকে হানাদার সৈন্যদের বীভৎস তান্ডবের সূত্রপাত হয়। ক্যান্টনমেন্টের খানসেনারা বিভিন্ন সমরাস্ত্রে সজ্জিত গাড়ি ও ট্যাঙ্ক নিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই অস্ত্রশস্ত্রের মোকাবিলা না করতে পেরে মুক্তিফৌজ দ্রুত পিছু হটতে থাকে। তারপর শুরু হয় এক অবর্ণনীয় কাহিনী। সারা শহর হানাদারেরা ছেয়ে ফেলে ও চারপাশে নির্বিচারে গুলী চালিয়ে খুন করতে থাকে। শহরে কোন নিষেধাজ্ঞা বা কারফিউ পূর্ব থেকে জারি করা হয়নি। ফলে রাস্তায়, দোকানে, বাজারে প্রচুর লোকজন ছিল, তাদের অনেকেই ট্যাংকের নিচে গুড়িয়ে যায়। পাকিস্তানী হানাদার জন্তুরা ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের ওপর যে অত্যাচার চালায়, তা বর্ণনা করা যায় না। অসংখ্য মহিলাকে তারা নির্বিচারে ধর্ষণ শেষে তাদের ওপর গুলী চালিয়ে খতম করে চলে যায়। ডাকঘরের ভেতরে ঢুকে ডাককর্মী ক্ষিতীশ চক্রবর্তীকে গুলী করে মারে। কোতয়ালির সাবইন্সপেক্টরের মাথায় সরাসরি গুলী চালিয়ে খুন করে, হত্যা করে রবীন্দ্রনাথ রোডের ওয়াহিদুর রহমানকে, যশোর রেজিস্ট্রি অফিসের করণিক হোসেন আলীকে, ৫ বছরের বালক আব্দুল মান্নানকে। রাজার হাটে ৯টি কিশোরকে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে গুলী করে হত্যা করে। মুক্তিফৌজের জনৈক ক্যাপ্টেনের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল ৮০০। সন্ধ্যার পর এই নরপশুরা রণ হুংকার দিতে দিতে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যায়। রাত্রে মুক্তিফৌজরা আবার ঐ স্থান ঘেরাও করে। ভেতর থেকে হানাদারেরা দুদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে দূরপাল্লার কামান থেকে শহরের চারপাশে গোলা বর্ষণ করতে থাকে ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। বাঙালী সৈন্যদের হাতে ছিল কিছু থ্রীনট থ্রি রাইফেল, পুরোনো মডেলের আমেরিকান রিভলভার এবং কিছু স্টেনগান। অধিকৃত অধিকাংশ মেশিনগানই তখন ছিল চৌগাছা ও কালিগঞ্জের শিবিরে। হানাদারদের গোলার আঘাতে শহরের অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। হোস্টেল, কলেজ,

চাচড়ার রাজবাড়ি, অফিস থেকে শুরু করে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের কিছুই এই গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। শহরের সাধারণ নর-নারী রাত থেকেই ভয়ে ঝিকরগাছা পেরিয়ে কপোতাক্ষর ওপারে নাভারণ ও বেনাপোলে আশ্রয় নিতে থাকে। ইতিমধ্যে শহরের নিকটবর্তী যাদবপুর অঞ্চলে একটি হানাদার ছাউনির ওপর মুক্তিফৌজ তীব্র আক্রমণ চালিয়ে ঐ আস্তানার সবকটি সৈন্যকে খতম করে এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়। এখানে তারা বেশ কিছু বুলেট, মর্টার, ওয়্যারলেস ও মেশিনগান উদ্ধার করে। যাদবপুরের লড়াইয়ে মারাযান মুক্তিযোদ্ধা দলের ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন। সেচ্ছাসেবকরা রাতারাতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রেললাইন উপড়ে ফেলেন। গভীর ট্রেঞ্চ খোড়েন ও রাস্তার মোড়গুলিতে ঘাঁটি তৈরি করেন। পরের দিন দুপুর তিনটের সময় ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনের মৃতদেহ নজরুল ইসলাম কলেজ প্রাংগনে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

৩১ মার্চ ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে দূরপাল্লার শক্তিশালী রকেট ছাড়া হতে থাকে। এগুলি ৭/৮ মাইল পর্যন্ত দূরে পড়তে থাকে এবং শহর প্রায় ফাঁকা হয়ে পড়ে। বহু মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক গোলার ঘায়ে সেদিন নিহত হন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে সাত মাইল দূরে সিঙ্গুলি অঞ্চল পর্যন্ত যশোরের গ্রামের মানুষেরা মুক্তিফৌজের জন্য খাদ্য ও পানীয় বহন করে আনতে থাকেন। বাঁশ দিয়ে স্ট্রেচার তৈরি করে স্বেচ্ছাসেবকরা হতাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেন। ১ এপ্রিলের দুপুরের মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ে বরাবর সব কটি পুল স্বেচ্ছাসেবকরা ধ্বংস করে ফেলেন। সেদিন বিকেলে ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ৫০টি মিলিটারি ট্রাক মুক্তিফৌজের কালিগঞ্জের ঘাঁটি দখল করতে গিয়ে ঝিনাইদহের কাছে একটি বিচ্ছিন্ন সেতুর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাদের একটি অংশ শহর থেকে ৫ মাইল দূরে বিশখালিতে ঘাঁটি তৈরি করে এবং চারপাশের গ্রামগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানেও তাদের অত্যাচারের কাহিনী হিংস্র পশুদের অত্যাচারকেও হার মানায়।

যশোরের তৎকালিন অবস্থা সম্পর্কে অমিতাভ দাশগুপ্ত লিখেছেনঃ বেনাপোল সীমান্তে যখন ঢুকলাম তখন বট, নিম ও তরু পল্লবের মাথায় মাথায় সূর্যের স্পর্শ লেগেছে। সাদিপুরে ঢুকতেই দুজন রাইফেলধারী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। খাকি হাফ প্যান্ট ও শার্ট, কাঁধে পিতলের চাকতির ওপর পরিষ্কার বাংলায় লেখা 'গ্রাম পুলিশ'। আমরা আমাদের প্রেস কার্ড দেখালাম। তক্ষুনি তারা দু'জন স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে আমাদের স্থানীয় আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। লীগের সহ সভাপতি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি আমাদের নিয়ে শহরাঞ্চলে বেরোলেন। আমরা একটি স্থানীয় দোকান থেকে কিছু সিগ্রেট কিনলাম ভারতীয় মুদ্রায়। কিন্তু দোকানী সে টাকা থেকে কোন বাট্টা কেটে নিলেন না। বললেন, আমরা ইন্ডিয়ার টাকা থেকে বাট্টা কাটা ২৭ মার্চ থেকে ছেড়ে দিয়েছি। ঘুরে ঘুরে সাদিপুর পেরিয়ে দিঘীরপাড় ও সারশা গ্রামে ঢুকলাম। অসংখ্য সাধারণ কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এমনকি কোন কোন বাড়িতে কিছু মহিলার সঙ্গে কথা হল। প্রতিটি বাড়ি, দোকান ও রাস্তায় যত্রতত্র উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ও শেখ মুজিবের ছবি। বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কিশোরদের মনোবল দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি।

একজন বৃদ্ধ বললেন, আমাদের পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। আমাদের গোটা জেলাটাই

লড়াই–এর মাঠ। তাই আমাদের বাঁচার জন্যই লড়তে হবে এবং শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। কথায় কথায় বেলা বাড়ছিল। বেলা ১১টা নাগাদ ঐ ভদ্রলোক আমাদেরকে একটি স্বেচ্ছাসেবক অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি কলকাতার চারটি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিকের চারজন, একজন ইতালিয়ান ও একজন বৃটিশ সাংবাদিক মুভি ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন। একটু পরেই মাথায় ব্যারেট আঁটা একজন কর্মী এসে বললেন, গাড়ি তৈরি। তার সঙ্গে বেরিয়ে এসে দেখি ইপিআর ছাপ মারা দুটি জিপ, মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ভদ্রলোক বললেন, উঠে পড়ুন। গাড়ি আপনাদের যশোর টাউনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স বষ্টি তলা পর্যন্ত নিয়ে যাবে সব নিজের চোখে ঘুরে ঘুরে দেখে আসুন।

প্রচণ্ড রোদের ভেতর ছাউনিবিহীন আমাদের জিপ ছুটে চলল। জিপের আগে পিছে দু'জন দু'জন করে স্টেনগানধারী সৈনিক। সারসা পেরিয়ে কাগজ পুকুর অঞ্চলে দেখলাম সারিবদ্ধভাবে স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে আছেন। আর একটু এগিয়ে নাভারণ একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দোকান, বাজার, হাট সব বন্ধ। কিন্তু মাঠে কৃষকদের কর্মরত অবস্থায় দেখলাম। রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি মাইল পোস্টে প্রহরীদের ব্যাপক সমাবেশ চোখে পড়ল। অস্থায়ী ছোট ছোট মুক্তিযোদ্ধা শিবির। এখানে ওখানে মটরসাইকেলে টহলদার বাহিনী। প্রতিটি গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা–দেখে খুব ভাল লাগছিল। নাভারণ পেরোতেই কপোতাক্ষ নদ। সেখানে আমাদের গাড়ি থামিয়ে সেতুরক্ষীরা কিছু প্রশ্ন করলেন। দেখলাম, কয়েকটি বড় মাপের ট্রাক সেতুর ওপারে ঝিকরগাছা থেকে ছুটে আসছে। ট্রাকে বহু মহিলা ও শিশু। বুঝলাম শহর এলাকা থেকে এদের নিরাপদ জায়গায় সামরিক তত্ত্বাবধানে সরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ঝিকরগাছায় প্রবেশ করার পর থেকে শহরতলীর প্রকৃত চেহারা চোখে পড়ল। রাস্তায় সেনা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক ছাড়া কদাচিত দু'একজন বেসামরিক মানুষ চোখে পড়ছিল। এখানে ওখানে ছোট ছোট ব্যারিকেড। মাঝে মাঝে মেঠো রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছিল। যশোর রোডের ডান পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে রেললাইন। কিন্তু একটু দূরে দূরেই ফিসপ্লেট আর স্লিপারগুলি খুলে রাখা হয়েছে। মাইল দুয়েক এগিয়ে আমরা খোদ যশোর শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। শহর মানে একটি দগ্ধ শেষ শহর। পালপাড়া এলাকাটিতে গরীব ও নিম্ন মধ্য বিত্তদের বসতি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত গোলায় পুরো এলাকাটি পুড়ে খাঁক হয়ে গেছে। গাছগুলি ঝলসানো প্রেতের চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে ঢুকলাম পুলিশ লাইন বেয়ে ষষ্টিতলায়। রাস্তায় প্রহরীদের রীতিমত ঘনঘটা। তিনচার বার আমাদের তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু কর্তব্যরত সৈনিকদের কোন সময় এতটুকু অসৌজন্যতা প্রকাশ করতে দেখিনি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত আরো লিখেছেন–ষষ্টিতলার মাঝামাঝি জায়গায় (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) স্বাধীন বাংলা সেনাদলের হেড কোয়ার্টার। পুরো এলাকাটি সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে ঘেরা, শুনলাম ওখান থেকে ক্যান্টনমেন্ট মাত্র এক মাইল দূরে। অর্থাৎ ছাউনিটি খুব ভালভাবেই রকেট রেঞ্জের মধ্যে। মেইন গেটে আমাদের গাড়ি এসে থামল। তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর চারজন সৈনিক আমাদের কয়েকটি শিবির ছাড়িয়ে একটি বড়ো একতলা বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। ঘরের ভিতর যশোর জেলা ও বাংলাদেশের দুটি বৃহদায়তন মানচিত্র। পরিচয়ের পর যিনি টেবিলের ও প্রান্ত থেকে আমাদের দিকে হাত

বাড়িয়ে দিলেন, তিনি মেজর, যশোর রণাংগণের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর সঙ্গে যখন আলোচনা চলছিল তখন কিছু দূরে ঘন ঘন গোলার শব্দ কানে আসছিল। মেজর বললেন, চুয়াডাংগা অঞ্চলে দুপক্ষের মধ্যে গত রাত থেকে মরণপণ লড়াই হচ্ছে। তাঁর বিবৃতি অনুযায়ী জানতে পারলাম বাঙালী সৈন্যরা বিমান ঘাঁটিটিকে নিশ্চিহ্ন করেছিল এবং ৩১ মার্চ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে হেলিপ্যাডটিকেও ধ্বংস করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে আছে। যানবাহন ও খাদ্যসামগ্রী প্রবেশের পথে ট্রেঞ্চ ও বড় বড় ব্যারিকেড। সেই ট্রেঞ্চে মেশিনগান পেতে হানাদার সৈন্য শিবির ঘিরে পাহারা দিচ্ছে সহস্রাধিক মুক্তিফৌজ। এছাড়া রাইফেল, ডিনামাইট স্টিক নিয়ে প্রস্তুত মুজাহিদ বাহিনী। মেজর বললেন, এভাবে আর পাঁচ-ছয়দিন অবরোধ করে রাখতে পারলেই ওরা খাদ্যের অভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। সমস্ত মানুষ সক্রিয়ভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা জিতবই।

ঘর থেকে বেরিয়ে একটি বড়ো ছাউনির ভেতর ঢুকলাম। সেখানে সৈন্যরা রাইফেল হাতে প্রয়োজনীয় ডাকের জন্য অপেক্ষমান। আর একটি ছাউনিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেটি অস্ত্রাগার। উঠোনে নেমে দেখলাম একটি একতলা বাড়ির বারান্দায় পুরো সামরিক পোশাক ও অস্ত্রে সজ্জিত জনপঞ্চাশেক কিশোর ও তরুণ যাদের কারোর বয়সই কুড়ির উর্ধ্বে নয়। শুনলাম তারা ক্যান্টনমেন্ট অবরোধে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। বাইরে এসে আবার ঐ জীপটিতে উঠলাম। দড়াটানা রোডের কাছে মাইকেল মধুসূদন কলেজটি দেখলাম গোলার ঘায়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্রাবাসটি। এখানকার হোটেল, স্কুল, সরকারী অফিস, দোকান প্রায় সব কিছুই ভেঙ্গে দুমড়ে একাকার। এখানে ওখানে হাত পা ছিন্ন অবস্থায় কিছু কিছু মৃতদেহ চোখে পড়ল। তাদের সারা শরীর এমনভাবে দগ্ধ হয়েছে যে মানুষ বলে চেনা যায় না। শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টের দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। এলাকাটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, পথে পথে অসংখ্য মৃতদেহ ক্যান্টনমেন্ট ও কাজিপাড়া রোডের মাঝখানে সারা রাস্তা জুড়ে এক বিশাল ব্যারিকেডের পর থেকেই গভীর করে ট্রেঞ্চ খোড়া হয়েছে। গাছের মাথায় মাথায় টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বসে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

ট্রেঞ্চের মধ্যে গোলন্দাজ বাহিনী। কাছেই একটি বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে চুইয়ে চুইয়ে ধোঁয়া উঠছে। শুনলাম ঘন্টা তিনেক আগে বাড়ির ওপর হানাদারদের নিক্ষিপ্ত একটি গোলা এসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘুর পথে এলাম পুরোনো কসবা অঞ্চলে। এখানে কয়েকজন আনসারের সংগে কথাবার্তা হল। এরা কেউ কেউ বেশ বিচলিত, কিন্তু কাউকেই দুর্বলচিত্ত মনে হয়নি। সেখান থেকে আবদুল আজিজ রোড ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড পেরিয়ে ঘোপ অঞ্চলে এসে ঢুকলাম। সেখানে দু'চারটি বাড়িতে লোকজনের সাক্ষাতও পেলাম তারা হানাদারদের কাহিনী বললেন। নারীদের ওপর অত্যাচারের একটি নৃশংসতম ঘটনা এখানে শুনলাম। পাঁচজন রমনীকে ধর্ষণ শেষে স্তন কেটে তারপর রাইফেলের সংগীন দিয়ে তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাকিস্তানীরা হত্যা করেছিল। ঐ নাগরিকরা বললেন, 'মা বোনের বেইজ্জতির বদলা আমরা নেবই।'

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম একাত্তুরের ২৮ মার্চ গোপালগঞ্জ থানা থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে তৎকালীন কালিয়া থানার এমপি এখলাস উদ্দীন সাহেবের সহযোগিতায় যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা শহরে ৫০জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে প্রবেশ করেন।
২৯ মার্চ তিনি জানতে পারেন, যশোরে পাক বাহিনীর সহিত মুক্তিবাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। তাই নড়াইল থেকে তিনি যশোর অভিমুখে রওনা হন। পথে হামিদপুরে এক প্লাটুন পাকসেনা ডিফেন্স নিয়েছিল। তার প্লাটুনও সেই এলাকার ছাত্র, পুলিশ ও কিছু বেংগল রেজিমেন্টের জোয়ানসহ ঐ দিনই রাত্রি সাড়ে তিনটায় তাদের ডিফেন্সের চারদিক থেকে আক্রমণ করা হয় এবং পাক সৈন্যরা পেছনের দিকে পালিয়ে যায়। যশোর ইপিআর সেক্টর হেড কোয়ার্টার থেকে তিনি জানতে পারেন যশোর-কলকাতা রোডের শংকরপুর নামকস্থানে পাক বাহিনীর সহিত ইপিআর বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ চলছে। রাতে তিনি অয়ারলেছে যুদ্ধের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে যোগাযোগ করেন। ৩১ মার্চ সকালে তিনি শংকরপুরে চলে যান এবং ইপিআর বাহিনীকে পুনরায় নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ডিফেন্স করে নেন। সেখানে ইপিআর বাহিনীর সুবেদার আবদুল মালেক অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত যশোর সেনানিবাসের চতুর্দিক ঘিরে রাখা হয়। সকল গুরুত্বপূর্ণ পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয় ও ডিফেন্স তৈরী করা হয়। সেই সময় ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য, কিন্তু প্রথমদিকে সাহায্য পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তখন আধুনিক অস্ত্রের সংখ্যা ছিল খুব নগন্য।
৩ এপ্রিল পাকবাহিনী যশোর সেনানিবাসের দুইদিক থেকে অর্থাৎ যশোর-ঢাকা রোড দিয়ে আক্রমণ করে। প্রথমে আর্টিলারী নিক্ষেপ করে ও মর্টার হতে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। গোলা নিক্ষেপ করতে করতে পাক সেন্যরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বল ছিল ২টি ৬ পাউন্ডার। দুইটিকে দুই রণাঙ্গণে বসান হল। ৬ পাউন্ডার থেকে পাকবাহিনীর উপর গোলা নিক্ষেপ করে বেশ কিছুক্ষণ তাদের অগ্রগতিকে রোখা গেল। এদিকে শংকরপুরের ৬ পাউন্ডারটি থেকে আর গোলা নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ঢাকা-যশোর রোডের উপর বসান ৬ পাউন্ডারটি নিয়ে আসার জন্য অয়্যারলেসে বলা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেটি নিয়ে আসার সময় পথে পাক বাহিনী ৬ পাউন্ডার ও চালককে আটক করে ফেলে। এদিকে পাক বাহিনীর আর্টিলারীর শেলে মুক্তি যোদ্ধারা টিকতে না পেরে পিছনে চলে আসে। সন্ধ্যার দিকে প্যাক বাহিনী, মুক্তি বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের উপর মর্টার নিক্ষেপ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলতে থাকে। ৩ এপ্রিল সারারাত উভয় পক্ষে গুলী বিনিময় হয়। মুক্তি বাহিনীর পক্ষে দুই কোম্পানীর মত ইপিআর ও আনসার-মুজাহিদ ছাত্র যুদ্ধ করে। এই

যুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী লেঃ মতিউর রহমান এমপি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন।

আব্দুল হালিম বলেনঃ ৪ এপ্রিল আমরা সকালে নড়াইলে পুনরায় একত্রিত হই। সেখানে নতুনভাবে মনোবল নিয়ে নড়াইল-যশোর রোডে দাইতলা নামক স্থানে বিকালে ডিফেন্স নেই। সে সময় আমাদের জোয়ানদের মোট সংখ্যা ছিল এক কোম্পানী। অপরদিকে সকল আনসার ও মুজাহিদ নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। দাইতলায় আমাদের ডিফেন্স খুব শক্ত করে গঠন করি। ৭ এপ্রিল পাক বাহিনী বিকালের দিকে আক্রমণ করে, কিন্তু আমাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে পাক সেনারা টিকে থাকতে পারে না। পাক বাহিনী পিছনে চলে যায়। এই যুদ্ধে পাক বাহিনীর আনুমানিক ৩০ জনের মত নিহত হয়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমাদের ডিফেন্স নষ্ট করতে পারেনি। আমাদের পক্ষে কোন হতাহত হয়নি। ৮ এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী পুনরায় আমাদের উপর আক্রমণ করে। পাক বাহিনী সেইদিন আর্টিলারী ও মর্টার ব্যবহার করে। আমরাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করি। প্রায় ৫ ঘন্টা উভয়পক্ষে ভীষণযুদ্ধ হয়। পরে আমাদের গোলাবারুদের অভাবে আর টিকে থাকা গেল না। আমরা পিছনের দিকে চলে আসতে বাধ্য হলাম। নড়াইলে আমরা কোম্পানী নিয়ে রাতে অবস্থান করি। ৯ এপ্রিল পাক বাহিনী নড়াইল মহকুমা শহরে বিমান হামলা চালায় এবং নড়াইল শহর দখল করে নেয়। ছত্রভংগ হয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা পুনরায় একত্রিত হতে থাকে এবং অনেকে ভারতে চলে যায়।

তৎকালীন যশোরের অবস্থা সম্পর্কে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেনঃ ২৫ মার্চ ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় কি ঘটেছিল তা তার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এমনকি ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথাও তিনি শোনেননি।

২৯ মার্চ ১২টার সময় অয়ারলেসের মাধ্যমে পাকিস্তানী ১০৭নং ব্রিগেডের আবদুর রহিম দুররানী তাদেরকে যশোর পৌঁছুতে বলায় তারা জগদীশপুর থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টে রাত ১২টায় পৌঁছায়। অনেক সৈন্য ছুটিতে থাকায় ব্যাটালিয়ানের সৈন্য সংখ্যা তখন ছিল ৪০০ জন।

৩০ মার্চ বিগ্রেডিয়ার দুররানী তাদের বাটেলিয়ান অফিসে যান এবং কামান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল জলিলকে বলেন যে, তাদের ব্যাটালিয়ানকে নিরস্ত্র করা হল এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলল। তারপর বিগ্রেডিয়ার দুররানী ব্যাটালিয়ান অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে চাবিগুলো নিজ হাতে নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ব্যাটালিয়ানের সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিগ্রেডিয়ার দুররানী চলে যাবার সংগে সংগে সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র যার যার হাতে নিয়ে নেয় এবং চতুর্দিকে পজিশন নেয়। বিদ্রোহের খবর পাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী দুই ব্যাটালিয়ান (২৫ বেলুচ রেজিমেন্ট এবং ২২তম ফ্রান্টিয়ার ফোর্স) সৈন্য বাঙ্গালী সেনাদেরকে তিনদিক দিয়ে আক্রমণ করার করে। কিন্তু বিদ্রোহী জোয়ানরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। এ সময় কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জলিল নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেন এবং অফিসে বসে থাকেন। তখন মেজর হাফিজ ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব নেন এবং পাঞ্জাবীদের আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রবৃত্তি কমে সেভাবে সৈন্যদের পুনঃগঠিত করেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন ও তার সংগে বিদ্রোহে যোগদান করেন। এভাবে সকাল আটটা থেকে বিকেল দুটা পর্যন্ত পাঞ্জাবীরা তাদের উপর

আক্রমন অব্যাহত রাখে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানীরা পূর্ব থেকেই বাঙ্গালী সেনাদের উপর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়েছিল, কেননা তারা মর্টার আক্রমণ করে এবং তা বিদ্রোহী ব্যাটালিয়নের উপরই করে। যেহেতু, পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানীরা বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে, সেহেতু তাদের সংগে তারা বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাতে পারবে না মনে করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

হাফিজ উদ্দিন আরো বলেনঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদেরকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম দিক দিয়ে আক্রমণ না করলেও পশ্চিমের খোলা মাঠে মাঝে মাঝে অবিরাম বৃষ্টির মত গুলী করছিল। আমরা পশ্চিম দিক দিয়েই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পশ্চিম দিক দিয়ে কভারিং ফাইটের সাহায্যে বের হবার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হই এবং চৌগাছায় একত্রিত হই। (চৌগাছা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম।। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হবার সময় আমি আমার কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জলিলকে আমাদের সংগে বিদ্রোহ করার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি রাজী হলনি।

যশোর ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধের সময় সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন শহীদ হন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীর উত্তম' উপাধীতে ভূষিত করেন। তাছাড়াও এ যুদ্ধে ৪০জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। চৌগাছায় একত্রিত হবার পর আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলি। দশজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারসহ আমার সাথে প্রায় ২২৫ জন সৈন্য ছিল। চৌগাছায় আমার ও আমার ব্যাটালিয়নের যুদ্ধ করার মত কোন গোলাবারুদ ছিল না। আমাদের সংগে যে সমস্ত গোলাবারুদ ছিল তা যশোর ক্যান্টনমেন্টের যুদ্ধেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সকলেরই একটি করে পোশাক ছিল। খাওয়া দাওয়ারও অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু ছাত্র ও জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ২ এপ্রিল চৌগাছা থেকে সলুয়া নামক গ্রামে সুবেদার এ বি সিদ্দিকের নেতৃত্বে এক কোম্পানী সৈন্য পাঠাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য (সলুয়া গ্রাম যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল পশ্চিম দিকে) চৌগাছা তখন আমার হেড কোয়ার্টার। এখান থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম ও উত্তর দিকের গ্রামগুলিতে পেট্রোলিং শুরু করি। হাবিলদার আবুল হাসেম এবং হাবিলদার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে সিতিবদিয়া নামক গ্রামে এ্যামবুশ পার্টি পাঠাই। হাবিলদার আবুল হাসেম ও হাবিলদার ইবরাহিম একটি পাকিস্তানী পেট্রোল পার্টিকে এ্যামবুশ করে। এতে ৫জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। ৭ এপ্রিল খবর পেলাম যে, মেজর ওসমান চৌধুরী চুয়াডাংগায় তার ইপিআর বাহিনী নিয়ে মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেছেন। ঐদিন আমি একটা জীপ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমান চৌধুরীর সংগে দেখা করতে যাই। তার সংগে সাক্ষাৎ করে তার নিকট থেকে কিছু চাইনিজ এম্যুনিশন, এক্সপ্লোসিভ, কয়েকটি জীপ এবং কয়েকটি রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে চৌগাছায় ফিরে আসি।

১০ এপ্রিল নায়েক সুবেদার আহাম্মদ উল্লাহর নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্যকে পাঠালাম হায়বতপুর গ্রামের ব্রীজ ধ্বংস করার জন্য। ব্রীজটি যশোর-ঝিনাইদহ বড় রাস্তায় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৫ মাইল। দূরে অবস্থিত ছিল। ভোর তিনটের সময় নায়েক সুবেদার

আহাম্মদ উল্লাহ উক্ত ব্রীজ উড়িয়ে দেয়। ব্রীজটি ভাংগার ফলে এবং ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিক মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যদের পেট্রোলিং এর দরুণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে কিছুদিনের জন্য ভয়ে বের হতে পারেনি। ১১ এপ্রিল সিপাই ড্রাইভার কালা মিয়াকে পাঠাই কোট চাঁদপুর থানায় কয়েকটি জীপ ও ট্রাক সংগ্রহ করে আনতে। কালা মিয়া কোট চাঁদপুর যাবার সময় খবর পায় যে, পাকিস্তানী সেনবাহিনীর একটা কনভয় কালীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত খবর পাবার পর কালা মিয়া আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন মুজাহিদকে নিয়ে কালীগঞ্জের এক মাইল দূরে এ্যামবুশ করে। উক্ত এ্যামবুশে ৩টা গাড়ি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং দশজন পাকিস্তানী সৈন্যও নিহত হয়। কালামিয়া হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে যখন একটা গাড়ির দিকে ছুঁড়তে যায় তখন তাঁর বুকে পাঞ্জাবীদের বুলেট বিদ্ধ হয় এবং সে সংগে সংগে শহীদ হয়।

১৪ এপ্রিল আমি আমার ব্যাটালিয়ান চৌগাছা থেকে তুলে নিয়ে বেনাপোলের ৩ মাইল পূর্বে কাগজ পুকুর গ্রামে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করি এবং যশোর-বেনাপোল রাস্তার দুধারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। এই সময় ইপিআর বাহিনীর দুটো কোম্পানী যোগদান করে। আমার সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৫৫০ জনে দাঁড়ায় এ সময় শত্রুর শক্ত ঘাঁটি ছিল নাভারণে। (নাভার বেনাপোল থেকে ১০ মাইল পূর্ব দিকে) আমি শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য নাভারণ এলাকায় পেট্রোলিং শুরু করি। ২১ এপ্রিল আমি নিজে ২০জন সৈন্য নিয়ে নাভারণ মূল ঘাঁটিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর রেইড করি। আমার রেইডে ১০জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় এবং ১৫জন আহত হয়। উক্ত রেইডে আমরা মর্টার ব্যবহার করি। এখানে আমার ৪জন সৈন্য আহত হয়।

২৩ এপ্রিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য কাগজ পুকুর গ্রামে আমাদের মূল ঘাঁটির উপর আক্রমণ করে। এখানে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ চলে। আমি আমার সৈন্যদেরকে নিয়ে পরে বেনাপোল কাষ্টম কলোনী ও চেকপোষ্ট এলাকায় বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে বলি। কাগজ পুকুরের এ যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রায় ৫০ জন সৈন্য নিহত হয় ও অনেক আহত হয়। এই যুদ্ধে আমার ১৫জন সৈন্য শহীদ হয়। ইপিআর বাহিনীর (বিডিআর) নায়েক সুবেদার মজিবুল হক এ যুদ্ধে শহীদ হন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীর বিক্রম' উপাধি প্রদান করেন।

এর পরবর্তী পনের দিন ধরে শত্রু পক্ষ বেনাপোল কলোনী ও চেকপোষ্ট এলাকা দখল করার জন্য বহুবার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিই এবং প্রতিহত করি। উক্ত পনের দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১০০জন সৈন্য নিহত হয়। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেনাপোল তারা দখল করে সেখানে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করবে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বাংলাদেশের পতাকাই উড়তে থাকে। এ এলাকা তারা কখনও দখল করতে পারেনি। বেনাপোলের যুদ্ধে আমার ১০জন সৈন্য শহীদ হন এ সংঘর্ষে হাবিলদার আবদুল হাই, হাবিলদার আবুল হাশেম (টি-জে), হাবিলদার মোহাম্মদ ইবরাহিম, ল্যান্স নায়েক ইউসুফ আলী, ল্যান্স নায়ক মুজিবুর রহমান, সিপাই আবদুল মান্নান অভূতপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সংগে যুদ্ধ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেয়। বড় আচড়া গ্রামে এ্যামবুশ করে হাবিলদার ফয়েজ আহম্মদ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ১৫জন সৈন্যকে হত্যা করে।

যশোরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফ বলেনঃ-২৩ মার্চ ইপিআর বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলে এবং সেই পতাকার সামনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গার্ড অব অনার প্রদান করে। অবাংগালীরা প্রতিবাদ তুলেছিল, কিন্তু তাদের যে আপত্তি টিকল না। ২৫ মার্চ তারিখে ঢাকা শহরে ইয়াহিয়ার জংগী বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর যখন যশোরে পৌঁছল, তখন মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, ক্রোধে গর্জন করে উঠল-এর উপযুক্ত প্রতিশোধ চাই। যশোর ক্যান্টনমেন্টে কামান, মর্টার আর মেশিনগানে সজ্জিত হাজার হাজার পাকসৈন্য মোতায়েন হয়ে আছে, যে কোন সময় তারা অগ্নি প্লাবন নিয়ে নেমে আসতে পারে। একথা চিন্তা করেও তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল না। ২৬, ২৭ ও ২৮ মার্চ, এই তিনদিনে ইপিআর এর চারটি ক্যাম্পের জওয়ানরা প্রতিরোধের সকল প্রকার ব্যবস্থা নিল। প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ২৯ মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্ট এর ভেতরে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এর পরিণাম কি হবে, তা তারা ভাল করেই জানত, তা সত্ত্বেও সেই অপমান তারা নিঃশব্দে মাথা পেতে মেনে নেয়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওরা আগেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের ম্যাগাজিনের চাবিটা কেড়ে নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা তাতেও দমল না। তারা ম্যাগাজিন ভেঙ্গে অস্ত্র বার করে নিয়ে এল। তারপর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই দুপক্ষে শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। একদিকে কামান, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য অপরদিকে হালকা হাতিয়ার সম্বল করে এক ব্যাটালিয়ান বাঙ্গালী সৈন্য। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংঘর্ষে বহু বাংগালী সৈন্য মারা গেল। বাকী সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে আসে।

এই সংবাদ দেখতে দেখতে সারা যশোর জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। আর বসে থাকার সময় নেই। ইপিআর বাহিনী আগে থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী হয়েছিল। এবার শহরের পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই পুলিশ বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হিমাংশু ব্যানার্জী, আকমল হোসেন ও পীযুষ।

পুলিশ ম্যাগাজিনের চাবি ছিল অবাঙ্গালী জমাদারের হাতে। হিমাংশু, আকমল আর পীযুশ তাকে বন্দী করে তার হাত থেকে চাবি নিয়ে ম্যাগাজিন খুলে ফেললেন। সেখান থেকে তারা সাত'শ রাইফেল, ছয়'শ শার্ট গান কিছু সংখ্যক ব্রেনগান এবং যথেষ্ট পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার করলেন। তারপর এই অস্ত্রগুলিকে বিদ্রোহী পুলিশ আর বিদ্রোহী জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। স্থির হল, এদেরকে এখনই অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিতে হবে। মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ব্যগ্র পুলিশ আর জনতা নিউ টাউনের নোয়া পাড়ার আমবাগানে ঘাঁটি করে বসেছিল। এখানে জনতার মধ্যে থেকে তিনশ জনকে বাছাই করে নিয়ে ষাটজন পুলিশ তাদের রাইফেল চালনা শিক্ষা দিল। মাত্র এক ঘন্টার মত সময়

পেয়েছিল তারা। এটুকু সময়ের মধ্যেই রাইফেল চালনায় অ, আ, ক, খ-টুকু আয়ত্ব করে নিল। সেদিন সেই আম বাগানেই এই নবদীক্ষিত শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের আহার্য দ্রব্য যোগাবার দায়িত্ব নিয়েছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঘরের মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই স্মরণীয় আম বাগানের মধ্যে তাদের মুক্তিসংগ্রামী ভাইদের জন্য রান্না করেছিলেন। সেই দিনই ইপিআর বাহিনী, ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'শর উপরে সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে চারটি সৈন্য বাহিনীর জীপ সম্ভবত শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী তাদের মধ্যে তিনটি জিপকে খতম করে দিল। এখান থেকে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম শুরু। সেদিন রাত দু'টার পর থেকে ভোর পর্যন্ত ক্যান্টমেন্টের শানতলা এলাকায় পাক সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচুর গুলী বিনিময় হয়।

৩০ মার্চ ভোর বেলা দু'দল পাক সৈন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে জীপে করে দু'দিকে যাত্রা করে। একদল চাচড়ার দিকে আর একদল খুলনার দিকে। মুক্তিবাহিনীও দু'দলে ভাগ হয়ে তাদের প্রতিরোধ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাক সৈন্যদের মধ্যে যে দলটি খুলনার দিকে যাত্রা করেছিল পুরাতন কসবার পুলের কাছে তাদের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটল। এই সংঘর্ষে পুলিশদের নেতা হিমাংশু ব্যানার্জী নিহত হলেন। চাচড়ার মুক্তিবাহিনীর হাতে ঘা খেয়ে পাক সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মুক্তিবাহিনী ক্যান্টনমেন্টে অবরোধ করে রইল। ৩১ মার্চ শহর থেকে চার মাইল দূরে যশোর-মাগুরা রোডের মুখে হাশিমপুর গ্রামে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার খোলা হোল। জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা প্রায় পাচশ' কয়েদী স্বেচ্ছায় এই ট্রেনিং সেন্টারে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রামের এই সমরসজ্জা শুধু যশোর শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রায় একই সাথে মহকুমা শহরগুলিতেও প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছিল। নড়াইলের এসডিও কামাল সিদ্দিকী এবং সেখানকার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে এক শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। যশোর শহরে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, এই খবর পেয়ে তারা শত্রুদের আক্রমণ করবার জন্য যশোর শহরের দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলল। নড়াইল মহকুমার হাজার হাজার লোক যার হাতে যা হাতিয়ার ছিল তাই নিয়ে এই যুদ্ধ মিছিলে যোগ দিল। যশোর-নড়াইল রোডের দু'ধারে গ্রামগুলি তাদের ঘন ঘন জয় ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতে লাগল।

নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া অঞ্চলেও একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নৌ-বিভাগের প্রাক্তন অফিসার শামসুল আলমের উদ্যোগে এই শক্তিশালী মুক্তিবাহিনীটি গড়ে উঠেছিল। তাঁর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শত যোদ্ধার এক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠল। এই মুক্তিবাহিনীর জন্য থানা থেকেও বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে দু'শর উপরে রাইফেল ও বন্দুক সংগ্রহ করা হয়েছিল। যশোর শহরের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহাগড়ার এই মুক্তিবাহিনীও যশোরের দিকে দ্রুত মার্চ করে চলল। এখানেই হাজার হাজার লোক তাদের যুদ্ধ যাত্রার সাথী হয়েছিল। এই যুদ্ধ মিছিল সম্পর্কে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কুল কলেজের মেয়ে নিয়ে গঠিত একটি নারী বাহিনী মুক্তিবাহিনীর অংশ হিসেবে এই যুদ্ধ-মিছিলে যোগদান করেছিল। মুক্তিবাহিনীর

যোদ্ধাদের জন্য রান্না করা এবং যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা, এটাই ছিল তাদের কাজ। এই বীর কন্যারা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে যশোর গিয়েছিল। ১ এপ্রিল থেকে ৩ এপ্রিল, এই তিনদিন হাজার হাজার পাক সৈন্য খাঁচার পাখির মত ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রইল। মুক্তিযোদ্ধাদের মরিয়া আক্রমণে আর হাজার হাজার ক্ষিপ্ত জনতার গর্জনে ওরা স্তম্ভিত হয়ে ওদের মনোবল হারিয়ে ফেলে।

এই তিনদিন শহরের মানুষ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ, কখনও দলে দলে, কখনও বা বিচ্ছিন্নভাবে যে যার হাতিয়ার উঁচিয়ে নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে। আওয়ামী লীগ কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিরোধের বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। ঘরের মেয়েরাও এগিয়ে আসতে চাইছে। এই মুক্তি সংগ্রামকে সফল করে তুলবার জন্য তারাও কিছু করতে চায়। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঘরে খাবার তৈরি চলেছে। নিজেরা এগিয়ে গিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছে।

পরপর তিনদিন ধরে অবরোধ চলছে। হাজার হাজার লোক ঘিরে আছে ক্যান্টনমেন্টকে। দিন রাত্রি অষ্টপ্রহর ধরে তারা পাহারা দিয়ে চলেছে। ক্যান্টনমেন্টের পেছন দিকে বিল অঞ্চল। সেখানেও পাহারা চলেছে, যাতে এরা কোন দিক দিয়ে বেরোবার পথ না পায়।

অবরোধের তৃতীয় দিনে অবরোধকারীদের সংখ্যা কমতে কমতে অবরোধের বেষ্টনী পাতলা হয়ে এসেছিল। উপযুক্ত সময় বুঝে অবরুদ্ধ পাক সৈন্যরা কামানের গোলায় পথ করতে করতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর দু'পক্ষে চলল যুদ্ধ। কামান, মর্টার আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে রাইফেলের লড়াই, এ এক দুঃসাহসিক অথচ মর্মান্তিক দৃশ্য। এই যুদ্ধে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অগ্নিস্রাবী কামান আর ভারি মেশিনগানের সামনে এই প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে। যশোরের রাজপথ রক্তেলাল হয়ে গেল, কত দেশপ্রেমিক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন তার হিসেব কেউ দিতে পারবেনা। শহরের রাস্তা অসংখ্য যোদ্ধার মৃতদেহে স্তূপিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা বেঁচেছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধকে পুনঃগঠন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেল এবং যশোরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল।

ইতিমধ্যে পাক সৈন্যরা যশোরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপন করে হামলাকারীদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। যশোর শহর থেকে দশ বারো মাইল দূরে মুরাদগড় গ্রাম। বারো বাজারের পাশেই মুরাদগড়। এখানে মুক্তিবাহিনীর একটি গোপন ঘাঁটি ছিল। খবর পাওয়া গেল যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য মুরাদগড়ের দিকে আসছে। স্থির হোল এদের উপর আচমকা হানা দিতে হবে। ভাগ্যক্রমে এদের হাতে একটি লাইট মেশিনগান ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় মাত্র তিনজন। একজন ক্যাপ্টেন আর দুজন তার সহকারী। খবর পাওয়া গেছে ওদের সঙ্গে আছে পাঁচ খানা জিপ, আর একখানা ট্রাক। সৈন্য সবশুদ্ধ শ' খানেক হবে। একশ জনের বিরুদ্ধে তিনজন। হোক তিন জন, এই নিয়েই তারা ওদের প্রতিরোধ করবে। যথা সময়ে ওদের সেই 'কনভয়' মুরাদগড়ে এসে পৌছল। মুরাদগড়ের পুলটা যেখানে তারই একপাশে ঘন ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নিয়ে বসেছিল। পাক সৈন্যরা নিশ্চিন্ত

মনে এগিয়ে চলেছিল। তাদের দুটো জীপ সবেমাত্র পুলটা পেরিয়ে ও পারে গেছে, এমন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের মেসিনগান গর্জন করে উঠল। এরকম অতর্কিত আক্রমনে আক্রান্ত হয়ে পাক সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে যায়। ঐদিকে ওদের মেশিনগান অবিরলধারায় গুলীবর্ষণ করে চলেছে। পাক সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নেবার আগেই তাদের প্রায় বাটজন হতাহত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এইতিনজন বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হাতে শহীদ হন। ৩ এপ্রিল তারিখে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকসৈন্যরা যশোর শহর পুনঃদখল করে নিল। মুক্তিবাহিনী শহর ত্যাগ করে নড়াইলে গিয়ে তাদের ঘাটি স্থাপন করল। কিন্তু যশোর শহর ছেড়ে গেলেও মুক্তিবাহিনীর একটা অংশ শহর থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে দাইতলা ফতেহপুরে পাক সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে ছিল তিনটা মেশিনগান। এই তিনটা মেশিনগানের মধ্যে একটি ছিল আব্দুর রউফ আর তার দুইজন সাথীর হাতে। ইপিআর বাহিনীর ৮/১০জন যোদ্ধা বাকী দুইটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এদের সাহায্য করবার জন্য জন পঞ্চাশেক ছাত্রও তাদের সঙ্গে ছিল। এই প্রতিরোধের দলটি দাইতলার যে খানে ঘাটি করেছিল সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল।

আব্দুর রউফ বলছিলেনঃ ১১ এপ্রিল পর্যন্ত শত্রুপক্ষের কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। ১২ এপ্রিল বেলা ১টার সময় আমরা যখন খেতে বসেছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম শহরের দিক থেকে একটা কাল রং এর জীপ এগিয়ে আসছে। একটু দূরে থাকতেই জীপটা থেমে গেল। মনে হোল, জীপের আরোহীরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, তাই ওখানে থেমে গিয়েছে। আমরা দেখামাত্রই খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। সাথে সাথে আমাদের তিনটা মেশিনগান একই সঙ্গে গর্জন করে উঠল। কিন্তু ওরা আগে থেকেই হুশিয়ার হয়ে জীপটাকে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। তাই আমাদের গুলী ওদের স্পর্শ করতে পারল না। তারপর গাড়িটা যেদিক থেকে এসেছিল। সেই দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে চলে গেল।

জীপটা চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু হোল। গোলাগুলী আমাদের সামনে এসে পড়ছিল। আমরা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিলাম। ঘন্টাখানেক ধরে এইভাবে গোলা বর্ষণ চলল। ওরা মনে করল, এই গোলা বর্ষণের পরে পথ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাদের প্রতিরোধ করবার মত কেউ নেই। তাই ওদের একটা পদাতিক দল নিশ্চিন্ত মনে যশোর-নড়াইল সড়ক দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম, উপযুক্ত সময় আসতেই আমরা মুহূর্তের মধ্যে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে মেশিনগান চালাতে শুরু করলাম। ওরা এজন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাই আমাদের তিনটা মেশিন গানের অবিরল গুলী বর্ষণের ফলে ওদের বহু সৈন্য মারা গেল। বাকী সবাই উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল। ওরা পালিয়ে গেল বটে কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেবার সময় দিল না। একটু বাদেই ওদের একটা বড় দল পুনরায় আমাদের উপর এসে হামলা করল। ওরা অস্ত্রে -শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েই এসেছিল, সঙ্গে মেশিনগানও ছিল। কিন্তু ওরা এবার আর সোজা পথ ধরে আসেনি। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে হঠাৎ এক সময় চমকে উঠে দেখলাম, ওরা দুটো দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে সাড়াশীর মত আক্রমণ করেছে এবং আমরা ঘেরাও হয়ে গেছি।

আমাদের উপর দুদিক থেকে গুলী বর্ষণ চলেছে। আমরা যেন গুলীর বেড়াজালের মধ্যে আটকে পড়তে যাচ্ছি। আমাদের সাথে সাহায্য করার মত যারা ছিল তারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের পাঁচজন যোদ্ধা শহীদ হলেন। কিন্তু তবু আমরা আমাদের মনোবল হারাইনি। আমাদের তিনটি মেশিনগান অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গুলী করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়ে সেই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই। শত্রুপক্ষ বুঝল, নড়াইলের পথ এখনও তাদের জন্য কণ্টকমুক্ত নয়। তাই তারা আর বেশি দূর না গিয়ে যশোর শহরে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে নড়াইলে এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে পাক সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী নড়াইল আক্রমন করতে রওনা হয়ে গিয়েছে। নড়াইল শহরের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। আবার সেই রাত্রীতেই ওরা নড়াইল শহরের উপর মারাত্মক রকম বোমা বর্ষণ করল। বিস্ফোরণের আগুণে জ্বলতে লাগল নড়াইল শহর। অবস্থা গুরুতর মনে করে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নড়াইল ছেড়ে লোহাগড়ার দিকে চলে গেল।

পরদিন যশোর থেকে এক বিরাট মিলিটারী বাহিনী নড়াইলে এসে হামলা করল। তাদের সঙ্গে ছিল বিহারী ও বাংগালী দালালরা। ওরা লুটের লোভে উম্মত্ত হয়ে ছুটে এসেছে। ওদের বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। ওরা নিশ্চিন্ত মনে নড়াইল শহরের ঘরে ঘরে লুটপাট করে ফিরে গেল যশোর শহরে। তখন নড়াইল শহরের বেসামরিক কোন শাসনই রইল না। কুখ্যাত গুন্ডা টগর সেই সুযোগে সারা শহরের উপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে যা খুশি তাই করে চলল। হারুন মোক্তার, ছালেমান মওলানা পাকসেনাদের প্রধান দালালে পরিণত হোল। এই পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী মূল অংশ চলে যায় লোহাগড়া। আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। এবার আমরা তিনজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আমরা স্থির করলাম নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শত্রু পক্ষ যতই প্রবল হোক না কেন এবং আমাদের অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন আমরা কিছুতেই এই সংগ্রাম ছেড়ে পিছনে যাব না। আমরা তিনজন আর আমাদের মেশিনগানটা। এই আমাদের শক্তি-সম্বল এই নিয়েই আমরা আমাদের নতুন পথে যাত্রা করলাম।

এবার আমরা নড়াইল শহর ছেড়ে লোহাগড়ার কাছে দীঘলিয়া গ্রামে চলে গেলাম। আমরা স্থির করেছিলাম। এবার আমরা নিজেদের উদ্যোগে একটি নতুন মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলব। এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছাত্র ও যুবকদের অভাব ছিল না। সামরিক ট্রেনিং পাওয়ার জন্য তারা অধীর হয়ে উঠেছিল। আমার ডাকে দেখতে দেখতে অনেক ছাত্র ও যুবক এসে জুটল। আমি দীঘলিয়াতে ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে এই সমস্ত যোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়ে চললাম। এদিকে পাক সৈন্যদের আগমনের ফলে স্থানীয় দালালরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল চোর ডাকাত গুন্ডা বদমাইসের দল। ওরা এই সুযোগে নিজেদের ফায়দা উত্তল করে নিচ্ছিল। ওদের পেছনে সামরিক সরকারের সমর্থন রয়েছে। তাই তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে, তারা যাই করুক না কেন। কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। দীঘলিয়ার কুখ্যাত চেয়ারম্যান নওশের আলী ছিল এমনি নাম করা একজন দালাল যাকে। পরে হত্যা করা হয়েছিল। নোয়াগ্রামের ছালাম সরদার ছিল আরেক দালাল।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাব সেক্টর কমান্ডর তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বলেনঃ পশ্চিম

রণাংগনে আমাদের সংগ্রাম এবং গৌরবের প্রতীক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস পর্যন্ত যশোর বেনাপোল চেক পোস্টে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীয়মান ছিল। এই পতাকার পেছনে ছোট ইতিহাস আছে।

এপ্রিলের শেষের দিকে যখন আমাদের জনশক্তি সীমান্তের অপর পারে চলে যায় তখনো বেনাপোল সীমান্তে উড্ডীয়মান পতাকাকে আমরা অসহায় ভাবে ফেলে যাইনি। মে মাসের প্রথমার্ধে যখন মুক্তিবাহিনীর সংগঠন এবং পুনর্বিন্যাস চলছিল তখন এই পতাকার সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন। ১৮ বিএসএফ-এর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মেঘ সিং (বীর চক্র)। এই রাজপুত অফিসারটি আমাদের পতাকাকে সম্মান দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন ১৮ বিএসএফ তাদের দুটো মেশিনগান দিয়ে এই পতাকাকে কভার করে রেখেছিল। একটা কাকপক্ষীও তার পাশে ভিড়তে পারেনি। সকাল দুপুর সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে মেশিনগান গর্জে উঠত, যদি তার আশেপাশে সমান্যতম গতিবিধি পরিলক্ষিত হত। পতাকাকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানীদের এই অপচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কতজন যে হতাহত হয়েছে তা সঠিক বলা মুশকিল। এই পতাকা নিয়ে সীমান্ত সব সময় সরগরম থাকত। এ পতাকা ছিল আমাদের অনাগত দিনের বিজয়ের প্রতীক। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, যশোর সেনা নিবাসে যখন প্রথম বেংগল রেজিমেন্ট আক্রান্ত হয় তখন মেঘ সিং তার ১৮-বি-এস-এফ ব্যাটালিয়ানকে নিয়ে বাংলাদেশের ভিতর স্বীয় অনুপ্রেরণায় ঢুকে পড়েন এবং ঝিকরগাছার কাছে তার বাহিনীর সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

জুন-জুলাই মাসে প্রথম বেংগল রেজিমেন্ট বেনাপোল সীমান্ত থেকে বিদায় নিয়ে বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে চলে যায়। এই সময় বাংলাদেশের পতাকাটি বেনাপোল সীমান্তে একটা স্বীকৃত সত্য হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমার কোম্পানী মিলে যৌথ ভাবে এই পতাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব নেই এবং বেনাপোল সীমান্ত থেকে প্রায় ৮০০ গজ জায়গা নো-ম্যানসল্যান্ড এ পরিণত হয়। আমার মনে আছে ওমেগা' রিলিফ দল যেদিন এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন আমি ২/৩ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে বড় গাছগুলির আড়াল নিয়ে ক্রল করে এগুচ্ছিলাম। চার/পাঁচ গজ দূরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন এদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাস্তার পাশ থেকে এদেরকে আমাদের পতাকা দেখাই এবং বলি যে, আমরা এই এলাকাও দখল করে আছি। এই ভাবে দীর্ঘ নয় মাস আমরা বেনাপোলের পতাকাকে রক্ষা করেছিলাম এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিন এই পতাকা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। পতাকা যেখানে উড্ডীয়মান ছিল তার আশে পাশে পেট্রোল পার্টি পাঠানো হত এবং তাদের সাথে পাক-বাহিনীর প্রতিদিন গুলী বিনিময় হত। বিবিসির প্রতিনিধি সে সময়ে এই এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অলিক কুমার গুপ্ত বলেনঃ সেক্টর কমাণ্ডার কর্ণেল মঞ্জুর সাহেব ১১ অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশের ম্যাপ দেখালেন এবং কোথায় কোথায় অপারেশন করতে হবে তা নির্দেশ করে দিলেন।

অক্টোবরের শেষে ঝিকরগাছার ২ মাইল দূরে শিমুলিয়া সাহেব বাড়িতে পাক বাহিনীসহ ১০জন রাজাকার ঘাটি করে অবস্থান করছিল। সেই ঘাটি থেকে পেট্রোল ডিউটিতে আসে

১৩জন পাকসেনাসহ বহু রাজাকার। এই দলের উপর আমরা আক্রমণ চালাই এবং ৩ জন সেনা, ১ জন বিহারী রাজাকার নিহত হয় এবং একজন রাজাকার আহত ও তিনজন জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে। পরে উক্ত তিনজন রাজাকার মুক্তিবাহিনীর সাথে কাজ করে। এই আক্রমণের ফলে পাক সেনারা এই মিশন ছেড়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ পুনরায় ঐ গ্রামে আক্রমণ করে এবং তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে ও বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

৩ নভেম্বর ১২ জন গন-বাহিনী ও সাবেক ইপিআর ৩০ জনকে নিয়ে ভোরের দিকে চৌগাছা বিওপি'র সামনে এ্যামবুশ পেতে রাখি। সেই সময় উক্ত বিওপি পাক সেনাদের দখলে ছিল। পাক সেনাদের একটা পেট্রোল পার্টির সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে। যখন পেট্রোল পার্টি ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তাদের সাহায্যের জন্য উক্ত বিওপি থেকে বহু পাকসেনা এসে আমাদের দলটিকে ঘিরে ফেলে এবং যুদ্ধ চলতে থাকে। আমারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। এই সংবাদ পেয়ে সাবেক মেজর নজমুল হুদা মুক্তিফৌজ ক্যাম্প থেকে যুবকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। ভারতীয় সৈন্যরা দূর থেকে ৩´ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে মুক্তিফৌজকে সাহায্য করে। যদিও এ্যামবুশ করে আমাদের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তা সম্ভব না হওয়াতে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে পাকসেনারা উক্ত বিওপি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে নিহত প্রায় ১৮/১৯জন মৃত পাকসেনার লাশ তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে জনসাধারণ আরো প্রায় ২০জন পাকসেনার লাশ বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে। স্টেনগান, চায়নিজ রাইফেল, এলএমজি ও একটি ছোট অয়্যারলেসও উদ্ধার করি। এই যুদ্ধে একজন সাবেক ইপিআর ল্যান্স নায়েক আহত হন। ১২ নভেম্বর সন্ধ্যার সময় চৌগাছা ঢুলামন কাটির মাঝামাঝি রোডে একটি গাড়িসহ রোডের ব্রীজ উড়িয়ে দিই আমি ও আমার তিনজন সংগী।

গোয়ালহাটি নামক স্থানে পাকসেনারা আমার দলের উপর ঈদের দিন আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে ৯জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন এবং ৩ জন গণ-বাহিনী সদস্য ও ৩ জন সাধারণ মানুষ শহীদ হন। জনসাধারণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। জনসাধারণ সেই সময় এই এলাকাতে সব সময় কাজ করেন মুক্তিবাহিনীর পক্ষে। সেই দিন কর্নেল মঞ্জুর ৬ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করার হুকুম দেন। এবার আক্রমণকালে পাক বিমান আক্রমন করে। পরে ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যে উক্ত এলাকা পুনরায় দখল করি। এরপর আমরা মিত্র বাহিনীর সাথে কাজ করতে থাকি। ২৪ নভেম্বর গরীবপুর গ্রামে মিত্র বাহিনীর সাথে ট্যাংক যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে পাকিস্তানী ১৪টি ট্যাংক ছিল। এই যুদ্ধে ৫টি ভারতীয় ট্যাংক নষ্ট হয়ে যায়। ১৪টি ট্যাংকের মধ্যে ৮টি কে ভারতে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হয়। ২৬শে নভেম্বর চৌগাছা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। ৭ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়।

১ এপ্রিল যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভারী কামান ও মেশিনগানে সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র কনভয় বারবাজার ও কালীগঞ্জ দখল করে এগিয়ে আসে ঝিনাইদহের দিকে। পাক

বাহিনীকে বাধা দেয়া হলো বিষয়খালির কাছে বেগবতী নদীর দক্ষিণ তীরে। আগে থেকেই ব্রীজের ক্ষতিসাধন করে এবং গাছের বড় বড় গুড়ি কেটে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল।

দুপুর ২টার দিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয় সামনাসামনি। এই সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানরা। আনসার বাহিনীর সদস্য এবং মুক্তিপাগল হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন এসডিপি ও মাহবুবউদ্দিন। ভারী অস্ত্র চালনা বা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের ছি না। কেবল ছিল মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করতে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। তাদের অসীম সাহসের কাছে হানাদার বাহিনীর কামানের গোলা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা বাধ্য হয়েপছু হটে ফিরে যায় ক্যান্টনমেন্টে। বিষয়খালির যুদ্ধে নিহত হলেনঃ সদর উদ্দিন, দুঃখ মোহাম্মদ, আব্দুল কুদ্দুস, খালিলুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, নজির উদ্দিন, এনামুল ও কাজী রফিকউল ইসলাম।

এরপরও প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। তবে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে দ্রুত, চারদিকে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১২ এপ্রিল থেকে শহরে গুজব রটতে থাকে পাকবাহিনী আসছে। অবশেষে ঝিনাইদহের ওপর পাক সেনাদের সাড়াশি আক্রমণ হয় ১৬ এপ্রিল এবং ঐদিনই ঝিনাইদহের পতন ঘটলো।

১৬ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। হানাদার বাহিনী যশোর, মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা তিন দিক থেকে ঝিনাইদহের ওপর প্রচণ্ড সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। কেবলমাত্র ঝিনাইদহ, যশোর সড়কের বিষয়খালিতে হানাদার বাহিনী দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু হানাদার বাহিনীর ভারী অস্ত্র ও কামানের গোলার মুখে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে প্রতিরোধব্যুহ ভেঙ্গে পড়ে। বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ থেকে ৩৯ জন স্বেচ্ছাসেবক তরুণকে সাহায্যের জন্য বিষয় খালিতে পাঠান হয়। বিষয় খালির পথে চুতলিয়ার মোড়ে দুটি ট্রাকই হানাদার বাহিনীর সামনে পড়ে যায় এবং কিছু বুঝে উঠবার আগেই হানাদারদের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে ট্রাক দুটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ৩৯ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ৩০ জনই ঘটনাস্থলে নিহত হয়। বাকি ৯ জনের কেউ গুরুতর আবার কেউ সামান্য আহত হয়ে জীবনে বেঁচে যায়।

দুপুর ১টার দিকে কামানের গোলাবর্ষণ করতে করতে হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে শহরের অসংখ্য দোকানপাট ও বাড়িঘর পুড়ে যায়। শহরে ঢুকেই হানাদাররা বাটার মোড় থেকে পোষ্ট অফিসের মোড় পর্যন্ত সকল দোকান পাটে আগুন লাগিয়ে পুড়ে দেয় পাক হানাদার ও তাদের সহযোগী বিহারী এবং স্বাধীনতাবিরোধীরা। সুযোগ সন্ধানী লোকজন ছেয়ে যায় সারা শহর। শুরু হয় অবাধ লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও হত্যাকাণ্ড। এ সময়েই নিহত হন মহকুমা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল গফুর। গোলাম মহিউদ্দিন, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান। ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল মিয়া রবীন্দ্রনাথ বসুসহ আরও বেশ কয়েকজন। শহরের সাধারণ নর নারী ভয়ে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সরকারী বদ্যালয়। পিটিআই ভকেশনাল ট্রেনিং স্কুল, পানি উন্নয়ন বিভাগ ও থানায় হানাদার বাহিনী তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। ১৬ এপ্রিল সকালে জেলার মহেশপুর, কোট চাঁদপুর ও কালীগঞ্জ থানার পতন হয়েছিল। দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পতন হয় এবং ঐদিন বিকালের মধ্যে জেলার অপর দু'টো থানা

হরিনাকুণ্ড ও শৈলকুপা হানাদারদের দখলে চলে যায়।
সংগ্রাম কমিটির অবস্থান ঝিনাইদহের পতনের সাথে সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামের অবসান ঘটে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের নবতর অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী মহকুমা ও থানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেন। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইপিআর মুজাহিদ ও আনসার বাহিনীর সদস্য, যারা প্রতিরোধ সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তারাও অস্ত্রসদ সংগ্রহের আশায় ভারতে আশ্রয় নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষকসহ হাজার হাজার তরুণ জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং ট্রেনিং ও অস্ত্রের আশায় সীমান্ত পাড়ি দেয়। আবার কিছু বেপরোয়া অসীম সাহসী যুবক ভারতে না গিয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে সরে গিয়ে স্থানীয় ভাবে নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলে এবং মাঝে মধ্যেই হানাদার সৈন্য ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের ওপর গেরিলা প্রক্রিয়ায় হামলা চালাতে থাকে।
এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে মহকুমা ও থানায় গঠন হয় শান্তি কমিটি। মে মাসের প্রথম দিকে আলবদর এবং রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয় কিছু সুযোগ সন্ধানী লোক। এরা দেশের মধ্যে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের খুজতে থাকে। ব্যাপকভাবে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণে লিপ্ত হয়। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত হানে। গ্রামের পর গ্রাম সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সম্পদ লুন্ঠিত হয়। পাইকারী ভাবে বেয়নেট রাইফেলের মুখে বিভিন্নস্থানে নারী ধর্ষণের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। মে মাসের মাঝামাঝি পাক মিলিশিয়ারা শৈলকুপায় বাবু হরিদাশ সাহাসহ ৬ জনকে একই স্থানে গুলি করে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষ দলে দলে দেশ ত্যাগ করে।
কামান্নার নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ আজও ঝিনাইদহবাসীর হৃদয় মনকে বিষাদগ্রস্ত করে। ২৬ নভেম্বর বিকালে শৈলকুপাকে হানাদারমুক্ত করার লক্ষ্যে মুজিব বাহিনীর ৪২জন তরুণ কামান্না আসে। কামান্না সে সময় ছিল মুক্ত এলাকা। গোপন সংবাদ পেয়ে হানাদার সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা ভোররাতে ঘুমন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। বিনা যুদ্ধে নির্মম মৃত্যুবরণ করে ২৭জন মুক্তিপাগল দামাল ছেলে।
মহেশপুর থানার কচুবিলা গ্রামে ও মহেশপুর হাসপাতালে হানাদার সৈন্যদের দুটি ক্যাম্প ছিল। কচুবিলা ক্যাম্পে ১৫/২০টি এবং হাসপাতাল চত্বরে ৫০/৬০টি গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন হানাদর সেনারা মহেশপুর, খালিশপুর, কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জে থেকে লোকজন ধরে নিয়ে এসে অমানবিক নির্যাতনের পর কাউকে জবাই করে, কাউকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে আবার কাউকে গুলি করে হত্যা করে গর্তগুলোর মধ্যে ফেলে দিত। সুন্দরী মেয়েদের বিভিন্নস্থান থেকে রাজাকারদের সহায়তায় ধরে নিয়ে এসে ৪/৫ দিন পাশবিক নির্যাতনের পর নির্মমভাবে হত্যা করে ঐসব গর্তে ফেলে দিত। তারপরেও দেশের ভিতরে স্থানীয় ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোলাম মোস্তফা, দবির উদ্দিন জোয়ার্দার, বকুল, খছির, রহমত আলী মন্টু, বিশারত, মশিউর, আলম, সোনা মোল্লা প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে মাঝে মধ্যে ঝিনাইদহ, কোটচাঁদপুর কালীগঞ্জ ও শৈলকুপা এলাকায় গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে হানাদার সেনা ও তাদের সহযোগী আলবদর রাজাকারদের বিব্রত করে রাখে। আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে জেলার সর্বত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরগেরিলা আক্রমনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ভারতে টেপ্রনিংপ্রাপ্ত দেড় সহস্রাধিক এবং স্থানীয় ভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত আরও দুই

থেকে আড়াই সহস্রাধিক তরুণ অসীম সাহস ও বুদ্ধিবলে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে হানাদার পাকসেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকার আলবদরদের ধ্বংস করতে থাকে। এ সময় হানাদার পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শৈলকুপা থানা সদর থেকে ১১/১২ মাইল পূর্বে আবাইপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটি ছিল। ৪৫ থেকে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে ছিল। ২৯ আগষ্ট সন্ধ্যার পর খবর এলো মাগুরা থেকে শ্রীপুর হয়ে এবং ঝিনাইদহ থেকে শৈলকুপা হয়ে পাকবাহিনী আসছে। তাড়াহুড়া করে মুক্তিযোদ্ধারা নদী পার হয়ে আলকাপুরের ওয়াপদা ড্রেনেজ ক্যানেলের মাথায় পরিখা খনন করে যুদ্ধের জন্য অবস্থান নেয়। ঝিনাইদহ থেকে আসা হানাদার পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা ভোররাতে আবাইপুর পৌছে। ঘাটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আবাইপুর ও পার্শ্ববর্তী মীনগ্রামের বাড়িঘরে আগুন লাগায় এবং বেপরোয়াভাবে লুটতরাজ করে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। ৩০ আগষ্ট বেলা সাড়ে ১১টার সময় হানাদার পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী আলবদর রাজাকাররা নদী পার হয়ে ড্রেনেজ ক্যানেল ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় ক্যানেলের অপর পারে পরিখার মধ্যে অবস্থান নেয়া মুক্তিযুদ্ধোরা আকস্মাত একযোগে তাদের ওপর বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু করে। প্রথম আঘাতেই রাজাকার আলবদরসহ শতাধিক হানাদার পাকসেনা নিহত হয় ও আহত হয় অনেক। অতর্কিত আক্রমণে হতবিহ্বল হানাদার সেনারা দ্রুত পিছু হটে অবস্থান নেয় এবং পাল্টা আক্রমন শুরু করে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শৈলুকপা সদর থেকে আরও হানাদার সেনা গিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। যুদ্ধ চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। শেষ দিকে হানাদার সেনা হেভি মেশিনগান ও মর্টার ব্যবহার করে। আধার ঘনিয়ে এলে কৌশলগত কারণে মুক্তি যোদ্ধারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে ফরিদপুরের কালিমহরে আশ্রয় নেয়। এ যুদ্ধে বেশকিছু অস্ত্র, হেলমেট, আর্মি কার্ড ও ব্যাংক ব্যাজ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে আসে। রহমত আলী মন্টুর নেতৃত্বে আলকাপুরের যুদ্ধে অংশনেয় ওস্তাদ বিশারত আলী, দবির উদ্দিন জোয়ার্দার, কামরুজ্জামান খুত, আমিনুল ইসলাম চাঁদ, আবদুল করিম, আবদুর সত্তার, সাজেদুর রহমান, ফরিদ রেজা, শমসের, বারিক, কাওসার, আলম, সূর্য, রানু প্রমুখ।

শৈলকুপা থানা সদর থেকে ১৪ মাইল পূর্বে কমিড়াদহ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ঘাটিতে ১শ' থেকে সোয়া শ' মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ১৩ অক্টোবর দুপুরের দিকে খবর এলো হানাদার সৈন্যরা শ্রীপুর থানার খামার পাড়ায় বাড়িঘরে আগুন দিচ্ছে, লুটতরাজ করছে এবং এই পথ দিয়েই তারা শৈলুকপায় যাবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো প্রতিরোধের। শ্রীপুর শৈকুপা সড়কের পাশে পরিখা খনন করে তিনটি দলে ভাগ হয়ে তিনটি ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান নেয় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা বিমানবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা এয়ারম্যান মজিবর রহমানের নেতৃত্বে। তিনটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন শহীদ নজরুল, মনোয়ার হোসেন, ও গোলাম রইস। বিকাল থেকে ভোর রাত পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা এ্যামবুশ করে থাকে। ভুল হয় এখানেই। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের খবর পৌছে যায় হানাদার সেনাদের কাছে। রাতের অন্ধকারে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে তিন দিক থেকে। সার্চলাইট নিক্ষেপ করে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করে। অতর্কিত আক্রমনে মুক্তিযোদ্ধারা হতবিহবল হলেও অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে সারারাত ধরে যুদ্ধ করে। নজরুল, আমিমুদ্দিন,

ইয়ারুদ্দিন, ইউসুপ, ইমারত আব্দুল হোসেন, আবু তালেব, দিদার হোসেন, মধু শেখ, আবু জাফর, শহীদুল, সুফিয়ান ও তকেল জর্দারসহ ৪১ জন মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের সহযোগী এ যুদ্ধে শহীদ হন। হানাদার বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলেন তার মধ্যে সোনা মোল্লা, ওস্তাদ বিশারত, আব্দুল হাই, আবুল কাসেম, মজনু, লাল্টু, রওশন, হায়দার, আবুল, কবীর উদ্দিন জোয়ার্দার ও প্রফেসর আহম্মদ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে শঙ্করদি গ্রামের মাঠের মধ্যে হানাদার সেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সম্মুখ যুদ্ধ হয়। ৬/৭ ঘণ্টা স্থায়ী এ যুদ্ধে ২০/২৫ জন হানাদার সৈন্য নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা সদর উদ্দিনসহ ১০/১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এ যুদ্ধ নেতৃত্বদেন সুবেদার হায়দার ও মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান। এক্সপ্লোসিভ দিয়ে কুমার নদের উপর শৈলকুপা ব্রিজের একাংশ মুক্তিযোদ্ধারা উড়িয়ে দেয়। পাহারারত হানাদার সৈন্য বেষ্টিত কুমার ব্রিজ ধ্বংসের কাজে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন মুক্তিযোদ্ধা কাজী আশরাফুল আলম ও মশিউর রহমান। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকেই ঝিনাইদহে গেরিলা যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে হানাদার সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা গ্রাম এলাকা ছেড়ে শহর এলাকার গুটিয়ে আসতে থাকে। এদিকে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং মুক্ত এলাকায় সৃষ্টি করতে থাকে। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে জেলার সীমান্ত থানা মহেশপুরসহ কোটচাঁদপুর ও কালীগঞ্জ থানা মিত্রবাহিনীর দখলে আসে ঐদিন রাতেই ৪ ডিসেম্বর প্রাক্তন হাবিলদার মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে ৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা হরিনাকুণ্ড থানা আক্রমণ করে এবং মাত্র আধাঘণ্টা যুদ্ধের পরেই থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ঝিনাইদহে পৌঁছে। ঝিনাইদহ শহরের পশ্চিম দক্ষিণ পাশে হানাদার বাহিনীর দুটো প্রতিরোধ ব্যুহ ছিল। বাড়িবাথান থেকে খোড়াপাড়া হয়ে গয়েশপুর পর্যন্ত ১ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রথম বা সম্মুখ ভাগ প্রতিরোধ ব্যুহ এবং ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের পুলিশ লাইন থেকে কাঞ্চনপুর, পাগলা কানাই হয়ে চুয়াডাঙ্গা সড়কের চানমারি আনসার ক্যাম্প পর্যন্ত পিছন বা দ্বিতীয় প্রতিরোধ ব্যুহ। প্রথম প্রতিরোধ ব্যুহ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পশ্চিমে গোয়ালবাড়ি গ্রামে অর্ধশতাধিক মুক্তিযোদ্ধা ইতোমধ্যে ঘাটি গেড়ে বসেছিল এর পিছনেই ছিল মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর ট্যাঙ্ক বহর পাগলকানাই সড়কের বাদিয়াকন্দের ব্রিজ পার হতে গেলে হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলার আঘাতে দুটো ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। নিহত হয় দেড় শতাধিক ভারতীয় মিত্রসেনা। পরে দুপুরের দিকে বিমান বাহিনীর কভারিং-এ থেকে পদাতিক বাহিনী শহরের দিকে অগ্রসর হয়। পবহাটি উদয়পুরের মাঠে বিমান থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে মিত্র সেনা নামানো হয়। বিমান থেকে এ সময় দুটো বোমা ফেলা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'টি বোমার আঘাতই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লক্ষ্য স্থল হানাদার বাহিনীর ঘাঁটি ক্যাডেট কলেজ ও চাকলাপাড়া কলেজ হোস্টেলে না পড়ে একটি বিল্লি অপরটি শাখারি দাহ চাঁদপুরের মাঠের মধ্যে পড়ে। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে হানাদার বাহিনী পিছু হটে কিছু শৈলকুপার দিকে বাকিরা ঢাকার পথে মাগুরার দিকে পালিয়ে যায়। ঝিনাইদহ মিত্রবাহিনীর দখলে আসে। এখানে ১০/১২ জন সাধারণ সৈনিকসহ হানাদার বাহিনীর ২ জন সুবেদার নিহত হয়। পালিয়ে

যাবার সময় তারা খাদ্য গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত পিটিআই ভবন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ শহর পতনের পরদিন ৭ ডিসেম্বর সকাল থেকে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা শৈলকুপা দখলের জন্য সমবেত হতে থাকে। সারাদিন ধরে চলে প্রস্তুতি। ২৫ শতাধিক মুক্তি পাগল দামাল ছেলে ৪টি দলে ভাগ হয়ে থানার চার পাশে অবস্থান নেয়। দক্ষিণে অবস্থান নেয় আবু আহাম্মদ সোদা মোল্যা ও গোলাম মোস্তফার দল, পূর্বে খালকুলা এলাকায় রহমত আলী মন্টু, উত্তরে বিশারত ওস্তাদ ও জোহরের দল এবং পশ্চিম এলাকায় অবস্থান নেয় আশরাফুল আলম ও দবির উদ্দিন জোয়ার্দারের দল, বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয় একযোগে আক্রমণ। একটানা ২৮ ঘন্টা যুদ্ধের পর ৮ ;ডিসেম্বর বিকালে থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে থানায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন জুবেরী রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ১৫ জন পাক সেনাসহ অর্ধ শতাধিক রাজাকার আলবদর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বন্দী হয়। শৈলকুপা থানা দখলের সাথে সমগ্র ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত হয়।

আট নম্বর সেক্টরের প্রথম সেক্টর কমান্ডার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আবু ওসমান চৌধুরী (আগষ্টে দায়িত্ব নেন মেজর এম এ মঞ্জুর) বলেনঃ যশোর ই, পি, আর বাহিনীর ৩নং সেক্টর সদরের অবস্থান ছিল যশোর শহরে। সেক্টর অধিনায়ক ছিলেন পাঞ্জাবী লেঃ কর্ণেল আসলাম খান এবং উপ অধিনায়ক ছিলেন একজন অবাঙালী মেজর সরদার আবদুর কাদের। সেক্টর সদরে ছিলো একটি সিগন্যাল কোম্পানীও একটি সাপোর্ট প্লাটুন। সিগন্যাল কোম্পানীর অধিনায়ক ছিলেন একজন বাঙালী ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন এবং সাপোর্ট প্লাটুন অধিনায়ক ছিলেন একজন বাঙালী জেসিও নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক। সেক্টর সদরের এ্যাডজুটেন্ট ও এ্যাডমিন অফিসার ছিলেন একজন বাঙালী ক্যাপ্টেন হাসমত উল্লাহ। সব মিলে সেক্টর সদরে অবস্থান করছিলো প্রায় ২০০ এর মতো ই, পি, আর সৈনিক। ৫০-এর মতো অবাঙালী এবং বাকীরা সব বাঙালী। সেক্টর সদরের সাপোর্ট প্লাটুনে ছিল ৩টি ৬ পাউন্ডার কামান ও ৩টি ৩´ মর্টার এবং সবধরণের প্রচুর গোলা বারুদ। খুলনাতে অবস্থান করছিলো যশোর সেক্টরের ৫নং উইং যার অধিনায়ক ছিলেন অবাঙালী মেজর। এই উইং এর সহকারী অধিনায়ক ও অন্যান্য উচ্চপদের সবাই ছিল অবাঙালী। উইং-এর অধীন ছিল ৫টি কোম্পানী যাদের অবস্থান ছিল নিম্নরূপঃ

সাতক্ষীরার কলারোয়াতে বাঙালী সুবেদার আবদুল জলিল সিকদারের নেতৃত্বে 'এ'কোম্পানী। উইং সদর খুলনাতে 'বি' কোম্পানী। বাঙালী সুবেদার হাসান উদ্দিনের নেতৃত্বে সি কোম্পানী। সাতক্ষীরার ভোমরা এলাকায়। নায়েব সুবেদার জব্বার আলীর নেতৃত্বে 'ডি' কোম্পানী। সাতক্ষীরার ঝুমঝুমপুরে, বাঙালী সুবেদার তারেক উল্লাহর নেতৃত্বে 'ই' কোম্পানী কালীগঞ্জে, সাপোর্ট প্লাটুন ছিল উইং সদরে।

অপরদিকে যশোর সেনানিবাসে অবস্থান করছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১০৭তম

ব্রিগেডের অধীন ২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ব্যাটালিয়ন, ২৭তম বেলুচ ব্যাটালিয়ন (রেকিও সাপোর্ট) এবং ১ম ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ এই ব্যাটালিয়ন গুলোর অবস্থান ও পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপঃ-

১ম ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন বাঙালী লেঃ কর্ণেল রেজাউল জলিলের নেতৃত্বে চৌগাছা এলাকায়।

২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ব্যাটালিয়নের ২ কোম্পানী ব্যাটালিয়নের উপ অধিনায়কের নেতৃত্বে খুলনা শহরে (৩০০জন)। মূল ব্যাটালিয়নের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ২৭তম বেলুচ ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানী ও অতিরিক্ত এক প্লাটুন (২০০জন) মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে কুষ্টিয়া শহরে। মূল ব্যাটালিয়নের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। এই বাহিনীর হাতিয়ার ছিল ১০৬ মিঃ মিঃ জীপারোহী আর-আর, ৩´-মর্টার, ২´-মর্টার, ৩·৫´ রকেটলাঞ্চার, হেভি, মিডিয়াম ও হালকা মেশিন গান, সাব মেশিন গান ও স্বয়ংক্রিয় চায়নীজ রাইফেল।

এছাড়া যশোর সেনানিবাসে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট ও অন্যান্য কোর ও সার্ভিস প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে কিছু কিছু বাঙালী সৈন্যের ও অবস্থান ছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৬ মার্চ তারিখে যশোর সেনানিবাসে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩০০। পদাতিক ও গোলান্দাজ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় ১৫০০ যাদের সবাই ছিল অবাঙালী। বাকী ৮০০ সৈন্যের প্রায় ২০০ জনের মতো ছিল বাঙালী। বাকী ৬০০ অবাঙালী সৈন্য সাপ্লাই, মেডিকেল, অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি সার্ভিসের ছিল। পদাতিক বাহিনী ব্যতিত অন্যান্যদের হাতিয়ার ছিল মিডিয়াম ও হালকা মেশিনগান, সাবমেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় চায়নীজ রাইফেল।

এছাড়া সেনানিবাসে সর্ব প্রকারের প্রচুর গোলা বারুদ মজুদ ছিল।

২৫ মার্চ রাত ১২টার দিকে যশোর সেনানিবাস থেকে পাক বাহিনীর একটি দল যশোর শহরে প্রবেশ করে প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে এবং সমগ্র শহরে টহল দিতে থাকে। পাক বাহিনীর আক্রমণাশঙ্কায় যশোর সেক্টরের বাঙালী ই,পি, আর বাহিনীও তাদের অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করে টহল দিতে থাকে। পাক সেনারা শেষ রাতে ই, পি, আর সেক্টর সদরের প্রতি লক্ষ করে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লে ই, পি, আর বাহিনীও তার পাল্টা জবাব দেয়।

২৬ মার্চ সকালে সিগন্যাল কোম্পানী অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন সেক্টর সদরে প্রবেশ করে সব বাঙালী ই, পি, আর-দের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার কিছুক্ষণ পর সেক্টর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আসলাম এসে দুপুর ১২টার পর তাদেরকে অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা করাতে সমর্থ হন। বিকেল ৪টার পর চুয়াডাঙ্গা ৪নং উইং এর ই, পি, আর-রা স্পূর্ণ বিদ্রোহ করেছে এ খবর দিয়ে সেক্টর সদরে অবস্থিত বাঙালী ক্যাপ্টেনদ্বয়কেও সেক্টর সদরের বাঙালী সৈনিকদের নিয়ে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণের সর্বাধিনায়ক মেজর এম, এ, ওসমান চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে বেতার মারফত ক্যাপ্টেন আওলাদ ও ক্যাপ্টেন হাসমত উল্লাহর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেনদ্বয় মেজর ওসমানের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হলেন না। তবে বাঙালী সৈনিকরা চুয়াডাঙ্গার বিদ্রোহের খবর পেয়ে যায়।

৩০ মার্চ সকাল ৯টার সময় যশোর সেনানিবাসে পাকবাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর

অতর্কিতে তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন হাফিজ তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ৩০ মার্চ সকালে ব্রিগেডিয়ার দুররানী আমাদের ব্যাটালিয়ন অফিসে যান এবং কম্যান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল জলিলকে বলেন যে আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে হবে। তারপর ব্রিগেডিয়ার আমাদের ব্যাটালিয়ন অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে চাবিগুলো হস্তগত করেন।
একই সময়ে পাক বাহিনী যশোরের পুলিশ লাইন এবং ই, পি, আর সেক্টর সদর দূর পাল্লার কামান ও অন্যান্য আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সেক্টরের বাঙালী ই, পি, আর রা হাবিলদার তৈয়বুর রহমানের নির্দেশে অস্ত্রগারের তালা ভেঙ্গে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। ই, পি, আর বাহিনী যশোর শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত পাক বাহিনীর উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ শুরু করে। পুলিশ বাহিনীও পাক বাহিনীর উপর গুলি ছুঁড়তে থাকে। ঐ দিন সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ বেসামরিক অস্ত্র জমা নিচ্ছিলো। কিন্তু পাক বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে যশোরের এস, পি, জনসাধারণের হাতে ঐসব অস্ত্র তুলে দেবার নির্দেশ দেন। কর্তব্যরত গোয়েন্দা বিভাগের ও সি জনাব আবদুল হামিদ তাঁর সহযোগীদের সহায়তায় সব অস্ত্র জনতার হাতে তুলে দেন। বাঙালী ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন ও ক্যাপ্টেন হাসমত উল্লাহ ইতিমধ্যে পরিবার পরিজনসহ সেক্টর থেকে অন্যত্র চলে গেলে নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক সেক্টরের বাঙালী ই, পি আর দের নেতৃত্ব হাতে নেন। তিনি ই, পি, আর-দের সংগঠিত করে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থাপন করার নির্দেশ দেন।
আবু ওসমান চৌধুরী আরো বলেছেন, খুলনায় ৫নং উইং সদরে অবস্থিত ই, পি, আর এর 'বি' কোম্পানী ও সাপোর্ট প্লাটুনের বাঙালী সৈনিকরা ২৫ মার্চের রাতেই বন্দী হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে অনেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য ৫নং উইং এর অন্যান্য কোম্পানীগুলি প্রথম থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে সমর্থ হয়েছিল। সুবেদার আবদুল জলিল শিকদারের নেতৃত্বে 'এ' কোম্পানী, সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে 'সি' কোম্পানী নায়েব সুবেদার জব্বার আলীর নেতৃত্বে 'সি' কোম্পানীর সাথে সংযুক্ত একটি প্লাটুন, সাতক্ষীরার ঝুমঝুম পুরে অবস্থানরত 'ডি' কোম্পানী যার এক প্লাটুন ছিল যশোর জেলখানা প্রহরায় এবং একটি প্লাটুন ছিল কোম্পানী সদর ঝুমঝুমপুরে, মোবারক উল্লাহর নেতৃত্বে 'ই' কোম্পানী কালীগঞ্জ থেকে অগ্রসর হয়ে মেজর ওসমানের নির্দেশে তিনটি কোম্পানী যশোরের ঝিকরগাছায় একত্রিত হয়। পরে বাঙালী ই, পি, আর-রা নায়েব সুবেদার ইলিয়াস পাটোয়ারীর নেতৃত্বে এক কোম্পানী যশোরের কারবালার কাছে; নায়েব সুবেদার সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে এক কোম্পানী যশোরের উপশহরে, গরীব শাহ মাজারের কাছে এক প্লাটুন ও যশোর খুলনা সড়কে এক কোম্পানী সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিলো। সার্বিক প্রতিরক্ষার নেতৃত্বে রইলেন সুবেদার আবদুল জলিল শিকদার।
অন্যদিকে যশোর সেক্টর সদরের বাঙালী ই, পি, আর দুইভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিরক্ষা রচনা করে। হাবিলদার তফাজ্জল আলীর নেতৃত্বে ৩২ জনের ক্যাডার দল সন্ন্যাসদীঘিতে এবং নায়েব সুবেদার আবদুল মালেকের নেতৃত্বে ৬০জন সেক্টর সদর প্রতিরক্ষায় রইলেন। চাঁচড়ার মোড়ে নায়েক মতিউর রহমানের কর্তৃত্বে একটি ৬-পাউণ্ডার কামান ও হাবিলদার তৈয়বুর রহমানের কর্তৃত্বে অপর ১টি ৬-পাউণ্ডার কামান চাঁচড়ার ট্রাফিক

ঝাইল্যাণ্ডে বসানো হলো।
৩০ মার্চ সন্ধ্যার পর পাক বাহিনীর ১টি জীপ, ১টি ডজ ও ১টি ৩-টন গাড়ী করে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খুলনা থেকে যশোর আসছিলো। যথাসময়ে পাক বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ই, পি, আর বাহিনী প্রস্তুত হয়ে রইলো। গাড়ীগুলো রেঞ্জে আসার সাথে সাথে একই সময়ে তিন দিক থেকে আক্রমণ করা হয়। ৬ পাউণ্ডার কামানের গোলার আঘাতে পাকবাহিনীর ২টি গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং বহু পাক সেনা নিহত হয়। গাড়ী থেকে নেমে তারা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা পূর্ব দিকে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু সেদিকেও ই, পি, আর বাহিনীর অবস্থান থাকায় তাদের হাতে চরম মার খায়। এই সংঘর্ষে ৫০ জনের মতো পাকসেনা নিহত হয়। অপর দিকে ২ জন ই, পি, আর সৈন্য শহীদ হয়। রাত ১২টার পর পাক বাহিনীর অন্যান্যরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেনানিবাসে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।
৩১ মার্চ যশোর শহর প্রথম দফায় সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। যশোরে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ বাঁধলে যশোরের ই, পি, আর চুয়াডাঙ্গার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। চুয়াডাঙ্গার উইং অধিনায়ক, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণের সর্বাধিনায়ক মেজর ওসমান যশোরের সাহায্যে ২টি কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেন। কোম্পানী দুটি যশোরের বারোবাজারে এসে পাক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ঐ কোম্পানীদ্বয় আর যশোর পৌঁছতে পারেনি। এদিকে ২ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা যখন সেনানিবাসে প্রবেশ করবে তখন দেখা গেলো যশোর সেনানিবাসে শ্বেত পতাকা উড়ছে। এতে মুক্তিযোদ্ধারা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। তখন এও দেখা গেলো যে পি, আই, এর এবং পাকবিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান গুলি কিছুক্ষণ পরপর যশোর বিমান বন্দরে ওঠা নামা করছে। এতে সবার মনে একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে সম্ভবতঃ পাক সেনাবাহিনী সেনানিবাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে সেনানিবাসে সাদা পতাকা উড়িয়ে তারা ঐ সময় ঢাকা থেকে ব্যাপকভাবে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছিলো।
১ এপ্রিল ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম যশোর রণাঙ্গণে ৫নং উইং এর তিনটি কোম্পানীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সুবেদার শিকদার ও হাবিলদার আউয়াল ভারত সীমান্তের ১শতম বি, এস, এফ, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মেঘ সিং এর কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ওদিকে ৩ এপ্রিল থেকেই পাকবাহিনী যশোরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাবে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় পাক সেনারা শহরের অবাঙালী বসতি এলাকায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয়।
পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে সেনানিবাসের নিকটস্থ অবস্থানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। অবাঙালীদের সামনে রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। তারা পুলেরহাট ও যশোরের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে সুবেদার হাসান উদ্দিন যে কোম্পানী নিয়ে সেনানিবাসের উপর ৩''-মর্টারের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা ব্যাহত হয়। পাক বাহিনীর আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করতে করতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল সুবেদার হাসান উদ্দিনের নেতৃত্বে নড়াইলের দিকে এবং অপরটি ঝিকরগাছার দিকে পিছু হটতে থাকে। ৬ এপ্রিলের মধ্যে যশোর শহর পাকবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

সুবেদার হাসান উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি নড়াইলে লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের দলের সঙ্গে মিলিত হয়। নড়াইলের মহকুমা প্রশাসক কামাল উদ্দিন সিদ্দীকীর সহায়তায় লেঃ মতিউর রহমান স্থানীয় আনসার, পুলিশ, ছাত্র, মুজাহিদ নিয়ে প্রতিরক্ষা সংগঠিত করছিলেন। যৌথ বাহিনীর নড়াইল থেকে অগ্রসর হয়ে যশোর উদ্ধার করবার জন্যে ঝুমঝুমপুর নামক স্থানে প্রতিরক্ষা রচনা করে। কিন্তু এপ্রিলের ৯ তারিখ পাক বিমানের ব্যাপক হামলায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বহু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে মাগুরা চলে যায়। ১৩ এপ্রিল পাক বাহিনীর কাছে নড়াইল শহরের পতন ঘটে।

মেজর ওসমানের নির্দেশক্রমে সুবেদার হাসান উদ্দিনের দলটি মাগুরার সীমাখালী নামক স্থানে প্রতিরক্ষা রচনা করে। কিন্তু পাক বাহিনীর চারদিক থেকে ব্যাপক আক্রমণে মাগুরাতে তাদের টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। পশ্চাদপসরণ করে ই, পি, আর বাহিনীর এই দলটি কামার খালী নদীর পাড়ে প্রতিরক্ষা পজিশন গ্রহণ করে। পরে কামার খালীর পতন ঘটলে ই, পি, আর বাহিনীর এই দলটি বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে রাজাপুর সীমান্ত ফাঁড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

যশোরের ই, পি, আর বাহিনীর উপর দলটি ঝিকরগাছাতে একত্রিত হয়। ই, পি, আর বাহিনীর অনুরোধে ভারতের ১৭নং বি, এস, এফ ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মেঘ সিং তাঁর ব্যাটালিয়নের দু'টি কোম্পানীকে অফিসারসহ পূর্ণ সামরিক সম্ভার নিয়ে ঝিকরগাছার লাওজান ঘাটের নিকট প্রতিরক্ষা রচনা করতে আদেশ দিলেন। পুলের হাট নামক স্থানে ই, পি, আর বাহিনীও প্রতিরক্ষা রচনা করে। ১১ এপ্রিল সকাল ১০টার দিকে পাকবাহিনী বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে ঝিকরগাছা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেল। পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ই, পি, আর বাহিনীর দুই প্লাটুন সৈন্য বেনাপোল সড়ক ধরে অগ্রসর হয়। কিছুদূর এগুতেই তারা পাক বাহিনীর সম্মুখীন হয়। উভয় পক্ষের সম্মুখ সংঘর্ষে বেশ কিছু হতাহত হয়। পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ই, পি, আর বাহিনী পিছু হটতে থাকে। এই যুদ্ধে ভারতীয় বি, এস, এফ এর দু'টি কোম্পানীও যোগ দেয়। ই, পি, আর ও বি, এস, এফ বাহিনী ঝিকরগাছা নদীর অপর পাড়ে পজিশন নেয়। উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলি চলতে থাকে। ১২ এপ্রিল ভোরে পাক বাহিনী তাদের গোলন্দাজ সাপোর্ট সহকারে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। এতে যুদ্ধে দু'জন ই, পি, আরও একজন বি, এস, এফ সৈন্য নিহত হয় এবং বি, এস, এফ এর একজন নায়েক ও একজন অয়্যারলেস অপারেটর সেটসহ পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। এরপর বি, এস, এফ বাহিনী ভারতে চলে যায় এবং ই, পি, আর বাহিনী বেনাপোলের কাগজ পুকুর নামক স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে।

সেক্টর কমান্ডার ওসমান চৌধুরী আরো বলেনঃ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণের সদর দপ্তর ১৮ এপ্রিল ইছাখালী থেকে বেনাপোলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেদিনই রণাঙ্গণের সর্বাধিনায়ক মেজর ওসমান বেনাপোল যশোর সড়ক ও দক্ষিণাঞ্চলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বেনাপোলের পূর্বদিকে কাগজ পুকুর ই, পি, আর এর দু'টি কোম্পানী দিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন। এ সময় ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্যকে (১৫০জন) বেনাপোল কাষ্টম কলোনীর দক্ষিণ ভাগে রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে

রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ঢাকা সেনানিবাস থেকে পালিয়ে এসে ক্যাপ্টেন সালাহ উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান মেজর ওসমানের সাথে যোগদান করেন।

২৩ এপ্রিল বিকেল সাড়ে তিনটায় পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ কাগজপুকুর আক্রমণ করে। পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা কাগজপুকুরের প্রতিরক্ষা গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। পশ্চাতে এসে তারা বেনাপোলের পূর্ব সীমানায় রাস্তায় দু'পাশে দুই কোম্পানী অবস্থান নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ফিল্ড টেলিফোন বা ফিল্ড অয়্যারলেসনা থাকার কারণে তাদের প্রতিরক্ষা পজিশন-গুলি কখনোই যোগাযোগ সমন্বয় করতে পারেনি, রণ-সদরের সাথেও তাদের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

পাকবাহিনীর বেনাপোলের পূর্বসীমানায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে সুরক্ষিত করার সুযোগ ও সময় দেয়নি। মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে ২৪ এপ্রিল ভোর চারটায় পাকিস্তান বাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের অবস্থানে টিকে থাকতে পারেনি। মেজর ওসমানের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে ৩´´-মর্টার সহ একটি সাপোর্ট প্লাটুন পাঠানো হয়। কিন্তু মর্টারের আঘাতেও পাকিস্তানীদের অগ্রাভিযান বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পাক সেন্যদের কিছু অংশ ই, পি, আর বাহিনীর পোষাক পরে অগ্রসর হচ্ছিলো। নায়েব সুবেদার মুজিবুর রহমান নিজেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেশিনগান দিয়ে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর মেশিনগানের সুইপিংফায়ারে পাক বাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধরত ই, পি, আর-রা ই, পি, আর পোষাক পরা পাকসেনাদেরকে নিজেদের সদস্য বলে ভুল করলো। কিন্তু যখন চিনতে পারলো তখন আর কোন উপায় ছিল না। নায়েব সুবেদার মুজিবুর রহমান পাক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন। নায়েব সুবেদার মুজিবুর রহমান সম্পর্কে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে-

মেজর সাহেবের নির্দেশ না শুনেই একখানা সামরিক জীপ ভর্তি এ্যামুনিশন নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান শহীদ মুজিবুর। প্রবল গোলাগুলি ও রকেট বৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিটি প্রতিরক্ষা পরিখায় এ্যামুনিশন পৌঁছে দিলেন তিনি। একটি মেশিন গান পরিখায় পৌঁছে দেখেন অসংখ্য শত্রু সেনা সম্মুখভাগ থেকে উক্ত পরিখার দিকে ধাবিত। মেশিন গানের আশেপাশে প্রবল গোলাবৃষ্টি হচ্ছে, একজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গানের পাশেই শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। বাকি দু'জন শত্রুর চাপের মুখে টিকতে না পেরে গানের লক্‌টা খুলে নিয়ে গানটা অকেজো অবস্থায় রেখে পিছু হটে গেছে। মুজিবুর তৎক্ষণাৎ সঙ্গী সৈনিকটিকে পার্শ্ববর্তী পরিখা থেকে লক্ আনার আদেশ দিয়ে নিজে পজিশন নেন এবং শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। সঙ্গীটির ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে তিনি নিজেই জীবন বিপন্ন করে লক্ নিয়ে এসে ফিট্ করেন, তারপর শত্রুর দিকে গুলি চালাতে শুরু করেন-এমন সময় তার সাহায্যকারী সৈনিকটি শত্রুর বুলেটে শাহাদাৎ বরণ করেন। মুজিবুর হামাগুড়ি দিয়ে তার লাশটি একটু দূরে সরিয়ে রাখেন এবং পুনরায় একাই শত্রু নিধনে মেতে ওঠেন-যদিও গানটি চালাতে তিন জন লোকের দরকার হয়। শত্রু যখন অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে তখন মুজিবুরের গানের বেল্টগুলো শূন্য হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে কোমর থেকে পিস্তল খুলে নেন। পিস্তলের গুলিও শেষ হয়ে যায়। শত্রু চারদিক

থেকে ঘিরে ফেলেছে; মুজিবুর রহমান তখন পাঞ্জাবীদের উদ্দেশ্যে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। 'আল্লাহ আকবর'–'জয়বাংলা' ধ্বনী সহকারে খালি হাতেই বীর বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর এক ঝাঁক গুলি এসে বিদ্ধ করে তাঁকে। ঝাঁঝরা হয়ে যায় তাঁর বুকের পাজর।

পাক বাহিনীর আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, কাগজপুকুরের পতন ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গণের সদরদপ্তর বেনাপোলের পতন ঘটেনি। বেনাপোল সদর দপ্তরে স্বাধীন বাংলার পতাকা সমুন্নত রাখতে তারা সক্ষম হয়েছিল। ইতিমধ্যে ই, পি, আর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সংখ্যক সৈনিক মেজর ওসমানের বাহিনীতে যোগদান করে। তিনি বাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করে সাতটি কোম্পানীতে বিভক্ত করে সাতজন অধিনায়কের নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী সাতটি এলাকায় ঘাঁটি তৈরী করেন এবং সম্মুখযুদ্ধ পরিহার করে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস ৮নং সেক্টরের যশোর অঞ্চলের কৃতিত্ব ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে পাক বাহিনী নাভারনের নিকটবর্তী গৌরিপুরে বাংকার তৈরী করে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করে। বয়রা সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হুদা এক কোম্পানী মুক্তি বাহিনী ও এক কোম্পানী এফ, এফ, নিয়ে ১ নভেম্বর রাত্রে পাকিস্তানীদের ক্যাম্প আক্রমণ করেন। পাক বাহিনী আক্রমণের মুখে তাদের বাংকার ছেড়ে পালিয়ে যায়। হুদার নির্দেশে লেঃ অলীক গুপ্ত এক প্লাটুন মুক্তি বাহিনী নিয়ে ৩ নভেম্বর ছিজলি বি,ও,পি'র পাক সেনাদের উপর আক্রমণ করেন। প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে পাক সেনারা পিছনে সরে যায়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পুনরায় মুক্তিবাহিনীর উপর প্রতি–আক্রমণ করে চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। এই পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা সেক্টর সদরে খবর পাঠান এবং পাকিস্তানীদের মোকাবেলা করতে থাকেন। খবর পেয়ে নাজমুল হুদা দুই প্লাটুন যোদ্ধা নিয়ে পাকিস্তানীদের উপর পাল্টা আক্রমণ করেন। মিত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে তিনি আর্টিলারী সাপোর্টেরও ব্যবস্থা করেন। মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ ও আর্টিলারী শেলের আঘাতে পাকবাহিনী ১২ জনের মৃতদেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।

মুক্তিবাহিনী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে নড়াইল, লোহাগড়া ও কালিয়া থানা নিয়ন্ত্রনে আনতে সমর্থ হন। মেজর নাজমুল হুদা ১২ নভেম্বর দুই কোম্পানী মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় চৌগাছার নিকটবর্তী পাকিস্তানী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। মিত্র বাহিনীর ১নং জম্মুকাশ্মীর রাইফেলস ব্যাটালিয়ন এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। যৌথ আক্রমণের মুখে পাক বাহিনী পালিয়ে গেলে মুক্তিবাহিনী সেখানে প্রতিরক্ষা রচনা করেন।

বিখ্যাত গরীবপুর যুদ্ধ সম্পর্কে সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী বলেন, চৌগাছা থানার গরীবপুর গ্রামে ২৪ নভেম্বর পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে পাকিস্তানীরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টায় ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর উদ্ধার কল্পে রণাঙ্গণে ভারতীয় ট্যাঙ্কের আমদানী করা হয়। উভয় পক্ষের ট্যাঙ্কের বিপরীতে ট্যাঙ্কের লড়াইয়ে পাক বাহিনীর ৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংশ হয়। অবস্থার পুনরুদ্ধারে পাক বাহিনীর জঙ্গী বিমান পাঠানো হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পাক সেনাদের সাপোর্ট দেবার সময় দু'টি বিমানকেই গুলি

করে ভূপাতিত করা হয় এবং বন্দী করা হয় দু'জন পাইলটকে। পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে বাংলাদেশের রণাঙ্গনে এটাই ছিল সবচেয়ে দুধর্ষ ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে 'বাংলা নামে দশ' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-

বাংলাদেশের চৌগাছা থানার অখ্যাত গ্রাম গরীবপুর। ২১শে নভেম্বর ভারতীয় ট্যাঙ্ক-ক্রুদের ত্বরিত লড়াইয়ে পাকিস্তানীদের তিনটি শ্যাফে ট্যাঙ্ক সেখানে বন্দী হলো। ৭৬ জন খানসেনা খতম। বাকীরা চম্পট। যাবার সময় ফেলে গেছে আরও ৮টি জখম ট্যাঙ্ক, রাশি রাশি মার্কিন আর চীনা অস্ত্র।

খানপুর সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর বাহিনী নিয়ে ২৬শে নভেম্বর জীবননগর থানা দখল করে ক্রমশঃ কোটচাঁদপুর কালীগঞ্জ ও ঝিনাইদহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। লালবাজার সাবসেক্টর কম্যান্ডার মেজর এ, আর, আযম চৌধুরী তাঁর বাহিনী নিয়ে মানিকনগর, মোবারকপুর ও রাজাপুর হয়ে মেহেরপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় ৮নং সেক্টর এলাকায় পাকিস্তানী ৯ম ডিভিশন চরম মারের সম্মুখীন হয়ে ডিভিশন হেড কোয়ার্টার যশোর সেনানিবাস থেকে সরিয়ে মাগুরা নিয়ে যায়। চৌগাছায় চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পাক সেনারা তিন ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে এবং ঝিনাইদহ-মেহেরপুর, ঝিকরগাছায় উত্তর-পশ্চিম ও সাতক্ষীরা-খুলনা এলাকাতে অবস্থান গ্রহণ করে।

মেজর রফিকুল ইসলাম পি, এস, সি যশোরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেনঃ ৩০ মার্চ সকাল ৯টায় ১৪ নং ডিভিশনের ১০৭তম ব্রিগেডের ২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ২৫তম বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্য এবং অন্যান্যরা মিলে হামলা করে। পাকসেনারা একই সময়ে যশোরের পুলিশ লাইন এবং ই,পি, আর, সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ভূমিগাড়ার কেশপাত্র এবং অন্যান্য আধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। সকলে দৌড়ে অস্ত্রাগার ভেঙ্গে অস্ত্র নিতে চেষ্টা করে কিন্তু পাক বাহিনীর পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী আর্টিলারী এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আঘাতের ফলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হয়। একমাত্র লেঃ হাফিজ কিছু সৈন্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈন্য মর্মান্তিকভাবে এবং বলতে গেলে বিনা যুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করে। পাকসেনারা শুধুমাত্র বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের হত্যা করেই নিবৃত্ত হয়নি, বেঙ্গল রেজিমেন্টের পরিবার-পরিজন, শিশু, নারী, বৃদ্ধদেরও নির্দ্বিধায় নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এমনকি কয়েকদিনের নবজাত দুধের শিশুকেও রেহাই দেয়নি। ৭নং ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স প্রধান লেঃ কর্ণেল এস, এ হাই এবং ক্যাপ্টেন আবুল কালাম

শেখকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকবাহিনীর এই হামলার খবর যশোর শহরসহ নানা স্থানে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে।

৩০ মার্চ সকালে সেনানিবাস থেকে গুলীর আওয়াজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেক্টরের বাঙালী ই, পি, আররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং হাবিলদার কাজী তৈয়াবুর রহমানের নির্দেশে সিপাই আবদুল গণি শাবল এনে সর্বপ্রথম অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে ফেলে। এর পরই সমস্ত বাঙালী ই,পি,আর সৈন্যরা অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। এই প্রসঙ্গে কাজী তৈয়াবুর রহমান তাঁর সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'আমি সেক্টর হেডকোয়ার্টারের 'কোতের' তালা ভেঙ্গে ফেলার জন্য সিপাই আবদুল গণিকে হুকুম করি, সে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পালন করে। আবদুল গনি কোয়ার্টার গার্ডের সম্মুখ থেকে 'শেভি' এনে কোতের তালা ভেঙ্গে দিল।

ই,পি, আর বাহিনী শহরের বিভিন্ন অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ শুরু করে। পুলিশ বাহিনীও পাকবাহিনীর জবাবে পাল্টা গুলী ছুঁড়তে থাকে। ঐ তারিখে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ বেসামরিক অস্ত্র জমা নিচ্ছিলো। পাকবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত অস্ত্র যশোরের এসপি জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কর্তব্যরত ওসি গোয়েন্দা স্কোয়াডের মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর সহযোগীদের সহায়তায় সমস্ত অস্ত্র জনতার হাতে তুলে দেন। ই, পি, আর বাহিনী সেক্টরের সমস্ত অবাঙালী ই,পি, আরদের নিরস্ত্র করে বন্দী করে। বাঙালী ক্যাপ্টেনরা সেক্টর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক সেক্টরের নেতৃত্ব হাতে নেন। তিনি ই, পি, আরদের সুসংগঠিত করে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করার নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরার কলারোয়াতে অবস্থানরত সুবেদার আবদুল জলিল শিকদারের নেতৃত্বে ৫ নং উইং-এর 'এ' কোম্পানী, সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে 'সি' কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ১৫ নং উইং-এর একটি প্লাটুন নায়েব সুবেদার জহুরুল আলীর নেতৃত্বে ও সাতক্ষীরা 'ডি' কোম্পানী যশোর এসে সেক্টর হেড কোয়ার্টারের অপর বাঙালী ইপিআরদের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৫ নং উইং-এর 'ডি' কোম্পানীর অপর দুটি প্লাটুনের একটি যশোর জেলখানা প্রহরায় এবং অপর প্লাটুন কোম্পানী হেড কোয়ার্টার ঝুমঝুমপুরে অবস্থান করছিলো। কালীগঞ্জ থেকে সুবেদার ওয়ারেক উল্লাহ তাঁর কোম্পানী নিয়ে মেজর ওসমানের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গার ৪নং উইং-এর অপর ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। ঐ কোম্পানী তিনটি যশোরের ঝিকরগাছায় একত্রিত হয়ে যশোরের পথে অগ্রসর হতে থাকে। বাঙালী ইপিআররা নায়েব সুবেদার ইলিয়াস পাটোয়ারীর নেতৃত্বে যশোরের কারবালার কাছে, নায়েব সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী যশোরের উপশহরে; গরীব শাহ মাজারের কাছে একটি প্লাটুন এবং সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি কোম্পানী যশোর-খুলনা সড়কে ডিফেন্স নিলো। ঐ দলের সার্বিক কমান্ডে রইলেন সুবেদার আবদুল জলিল শিকদার।

যশোর সেক্টরের ইপিআর সৈন্যরা মূলতঃ দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করলো। হাবিলদার তোফাজ্জল আলীর নেতৃত্বে ৩২জনের ক্যাভার দল যশোরের সন্ন্যাসীদিঘিতে এবং নায়েব সুবেদার মালেক ৬০জন ইপিআর নিয়ে সেক্টর প্রতিরক্ষায় রইলেন। চাঁচড়ার মোড়ের উত্তর পাশে একটি ৬ পাউন্ডের কামান বসানো হলো। কমান্ডার রইলেন নায়েক মতিউর রহমান। চাঁচড়ার ট্রাফিক আইল্যান্ডে অপর একটি ৬

পাউন্ডের কামান রাখা হলো এবং কমান্ডার হলেন হাবিলদার তৈয়াবুর রহমান।
৩০ মার্চ সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১টি জীপ, ১টি ফ্লেড এবং ১টি ৩ টন গাড়ী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ খুলনা থেকে যশোহর আসছিলো। পাক বাহিনীর আগমনের সংবাদ যশোরের ইপিআর বাহিনী যথাসময়ে পেয়েছিলো এবং তারা তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলো। গাড়ী তিনটি রেঞ্জের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে তিন দিক থেকে আক্রমণ করা হয়। ছয় পাউন্ডের কামানের আঘাতে পাক বাহিনীর দু'টি গাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক পাকসেনা নিহত হয়। পাকসেনারা গাড়ী থেকে নেমে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা পূর্বদিকে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু পূর্বদিকেও ইপিআর বাহিনী থাকায় তারা চরমভাবে মার খায়। জানা যায়, সংঘর্ষে পাক সেনাবাহিনীর ৫০ জনের মতো সৈন্য নিহত হয়েছিলো। অপরদিকে দু'জন ইপিআর শহীদ হন। রাত বারোটার দিকে পাকসেনার অবশিষ্ট সৈন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যশোর সেনানিবাসে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।
যশোরে পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে যশোরের ইপিআর চুয়াডাংগা ইপিআর-এর সঙ্গে অয়্যারলেসে যোগাযোগ করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে। চুয়াডাংগা উইং কমান্ডার দু'টি কোম্পানী যশোরের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। কোম্পানী দু'টি যশোরের বারবাজারে এসে পাক বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে ঐ কোম্পানী দু'টি আর যশোর পৌঁছতে পারেনি। এদিকে সেক্টরে বাঙালী অপারেটর সিপাই মুজিবুল্লাহ পাঠান অয়্যারলেস সেট মারফত বাংলা, উর্দু, এবং ইংরেজীতে সমগ্র বিশ্বের কাছে বাঙালীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আকুল আবেদন জানাতে থাকেন। যশোর শহর মুক্ত হলে মুক্তিযোদ্ধারা সেনানিবাসের প্রায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এমন সময় সেনানিবাসে শ্বেতপতাকা উড়তে দেখা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এই সময় লক্ষ্য করা গেলো পিআইএ-র এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিবহন বিমানগুলো কিছুক্ষণ পর পর যশোর বিমান বন্দরে ওঠানামা করছে। অনেকে ধারণা করেছিলো সম্ভবতঃ পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেনানিবাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে সেনানিবাসে সাদা পতাকা উড়িয়ে ঐ সময় ঢাকা থেকে ব্যাপকভাবে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিলো।
১ এপ্রিল ছুটি ভোগরত বাঙালী সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম যশোর রণাঙ্গনে এলেন। ক্যাপ্টেন হালিমকে খুলনা ৫নং উইং থেকে আগত তিনটি কোম্পানীর নেতৃত্বে দেয়া হলো। ১ এপ্রিল তারিখেই নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক, হাবিলদার আউয়াল এবং সিপাই মুজিবুল্লাহ পাঠান ভারত থেকে সাহায্যের প্রত্যাশায় বেনাপোল হয়ে ভারতে যান। ৩ এপ্রিল ক্যাপ্টেন আবদুল হালিমের নির্দেশে সুবেদার আবদুল জলিল শিকদার ও হাবিলদার আউয়াল সামরিক সাহায্যের জন্যে বেনাপোল হয়ে পুনরায় ভারতে যান। সেখানে সামরিক সাহায্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। ভারতের ১৭তম বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মেঘ সিংহ সামরিক সাহায্য দেয়ার আশ্বাস দিলেন। ৩ এপ্রিল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোরের মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অবস্থানের উপর হঠাৎ করে ব্যাপকভাবে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। লক্ষ্য করা গেলো, শহরের দক্ষিণে যে অবাঙালী বসতি ছিলো, সেই বসতির প্রায় প্রতি বাড়ীতে পাক বাহিনীরা ডিফেন্স নিয়েছে।

পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে সেনানিবাসের নিকটস্থ অবস্থানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে থাকে। তারা সেনানিবাস ছাড়াও যশোর শহরের দক্ষিণে চাঁচড়ার মোড়ের রেলগেটে, উত্তর দিকে নতুন শহরের অবাঙ্গালী অবস্থান এবং পূর্বদিকে বারান্দপাড়া ও বেজপাড়াতে অবাঙ্গালীদের সামনে রেখে আক্রমণ চালিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিলো। তারা পুলেরহাট এবং যশোরের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে সুবেদার হাসান উদ্দিন যে কোম্পানীটি নিয়ে সেনানিবাসের উপর ৩" মর্টারের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা ব্যাহত হয়। পাক বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা আরও পিছু হটতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সমগ্র দলটি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নড়াইলের দিকে এবং অপরটি ঝিকরগাছার দিকে হটে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করে। ৬ এপ্রিলের মধ্যে যশোর শহর পাকবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

সুবেদার হাসান উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি নড়াইলে অবসরপ্রাপ্ত বি এম মতিউর রহমানের দলের সঙ্গে মিলিত হয়। মতিউর রহমান নড়াইলে মহকুমা প্রশাসক কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর সহায়তায় আনসার, পুলিশ, মুজাহিদ, ছাত্র যুবক নিয়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করার চেষ্টা করছিলেন। যৌথ বাহিনী নড়াইল থেকে অগ্রসর হয়ে যশোর উদ্ধার করার জন্য ঝুমঝুমপুর নামক স্থানে ডিফেন্স নেয়। কিন্তু এপ্রিলের ৯ তারিখে পাক বিমানের ব্যাপক হামলায় মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বেশকিছু হতাহত হয়ে পিছু হটতে থাকে। পাকবাহিনী নড়াইল শহর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। সুবেদার হাসানউদ্দিন ইপিআর বাহিনী নিয়ে নড়াইল ছেড়ে মাগুরা চলে যান। মাগুরাতে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন প্রধানের নির্দেশক্রমে ইপিআর-এর এই দলটি সীমাখালী নামক স্থানে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে। কিন্তু মাগুরাতেও মুক্তিযোদ্ধাদের টিকেথাকা সম্ভব হলো না। চারদিকের ব্যাপক আক্রমণে ইপিআর বাহিনীর এই দলটি কামারখালী নদীর পাড়ে ডিফেন্স নেয়। পরে কামারখালী ডিফেন্সও পতন ঘটলে এখনা থেকে ইপিআর বাহিনীর দলটি রাজাপুর সীমান্ত ফাঁড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। যশোরের অপর ইপিআর বাহিনীর দলটি ঝিকরগাছাতে একত্রিত হয়। ইপিআর বাহিনীর অনুরোধে ৭ এপ্রিল ১৭ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল মেঘ সিং বিএসএফ-এর অফিসারসহ দুটি কোম্পানীকে পূর্ণ সামরিক সজ্জায় নিয়ে ঝিকরগাছা লাউজান গেটের নিকট ডিফেন্স নিতে বললেন। পুলেরহাট নামকস্থানে ইপিআর বাহিনীও প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে।

মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি আরো বলেনঃ ১১ এপ্রিল পাকবাহিনী সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে গ্রাম-বাড়ী পুড়িয়ে, ধ্বংস হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে অগ্রসর হতে থাকে। হাবিলদার ওবায়দুল হক টেলিফোনযোগে ঐ সংবাদটি লাউজানি অবস্থানরত ইপিআর বাহিনীকে জানান। নায়েব সুবেদার আব্দুল জব্বার একটি প্লাটুন এবং হাবিলদার নি. হোসেন ও হাবিলদার বেলায়েত হোসেন ওপর একটি প্লাটুন নিয়ে প্রতিরোধে অগ্রসর হন। বেনাপোল সড়ক ধরে কিছুদূর অগ্রসর হলে তারা পাক বাহিনীর মুখোমুখি হন। উভয় পক্ষের সম্মুখ সংঘর্ষে বেশ কিছু হতাহত হয়।

প্রবল আক্রমণে ইপিআর বাহিনী পিছু হটতে থাকে। ঐ যুদ্ধে ভারতীয় বিএসএফ-এর দু'টি কোম্পানীও যোগ দেয়। ইপিআর বাহিনী এবং বিএসএফ কোম্পানীদ্বয় ঝিকরগাছা নদীর ওপর পাড়ে পজিশন নেয়। উভয় পক্ষে গোলাগুলি চলতে থাকে। ১২ এপ্রিল ভোর বেলায় পাকবাহিনী আর্টিলারী সাপোর্টে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। প্রচন্ড যুদ্ধে ইপিআর বাহিনীর দু'জন এবং বিএসএফ বাহিনীর একজন নিহত হয়। বিএসএফ-এর একজন নায়েক এবং একজন অপারেটর অয়্যারলেস সেটসহ পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এরপর বিএসএফ বাহিনী ভারতে চলে যায়। ইপিআর বাহিনীর পুনরায় বেনাপোলের কাগজপুকুর নামক স্থানে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে।

১৮ এপ্রিল তারিখে মেজর ওসমান বেনাপোল-যশোর রোড এবং দক্ষিণাঞ্চলের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। বেনাপোলের পূর্ব দিকে কাগজপুকুরে ইপিআর-এর দু'টি কোম্পানী প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে।

২০ এপ্রিল সকাল ১০টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত সেনাপতি কর্ণেল এম, এ, জি, ওসমানী মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। সদর দফতরে মেজর এম, এ, ওসমান চৌধুরীর সঙ্গে ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ অফিসার ছিলেন।

এই সময় প্রথম বেংগল রেজিমেন্টের ১৫০ জন সৈন্যকে লেঃ হাফিজের নেতৃত্বে বেনাপোল কাস্টম কলোনীর দক্ষিণ ভাগে রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে রাখা হয়েছিলো। ২৩ এপ্রিল সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং ব্রিটিশ এমপি ডগলাসম্যান বেনাপোলে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। ঐ তারিখে বিকেল সাড়ে তিনটায় পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর চরম আঘাত হানে। মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপক আক্রমণে টিকতে না পেরে কাগজপুকুর থেকে প্রতিরক্ষা তুলে বেনাপোলের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত সংকুচিত করে। ২৪ এপ্রিল ভোর চারটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ টিকে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সেচেষ্টা ফলবতী হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে ৩" মর্টার দিয়ে ইপিআর-এর একটি সাপোর্ট প্লাটুনও পাঠানো হয়। কিন্তু মর্টারের আঘাতেও পাকবাহিনীর অভিযান বন্ধ করা যায়নি। হাবিলদার মেজর মুজিবর রহমান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমজি দিয়ে পাকবাহিনীর গতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুবেদার খায়রুল বাশার তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "শত্রুর প্রবল আক্রমণে আমাদের টিকে থাকা বেশ মুশকিল হয়ে পড়লো। চারদিকে বৃষ্টির মত গোলা পড়তে লাগলো। হাবিলদার মুজিবরকে বার বার পিছু সরে আসতে বললে সে বললো, "হাবিলদার মুজিবর পিছুতে জানে না। তারপরই হাবিলদার মুজিবরকে আর দেখতে পেলাম না।"

সূত্রঃ যশোর অঞ্চলের কোহাগাড়া নড়াইলের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ জনাব আনোয়ারুজ্জামান বলেনঃ ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা যে ফলপ্রসূ হবে

না এটা লোহাগড়ার নেতৃবৃন্দ আগেই আশংকা করেছিলেন। তাঁরা আরও বুঝেছিলেন যে পরিস্থিতি বাংগালীদের একটা স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেজন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে জনাব নূর মহাম্মদ মিঞা, জনাব আনোয়ারুজ্জামান, জনাব মুন্সী আতিয়ার রহমান, জনাব মুন্সি সামছুল আলম প্রমুখের নেতৃত্বে মার্চের ১০/১২ তারিখ থেকে প্রতিরোধবাহিনী তথা মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করে প্রাথমিক ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ হল। ২৬শে মার্চ সকালে তাটিয়াপাড়া অয়্যারলেস মারফত স্বাধীনতার ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথে জনাব নূর আহম্মদ মিঞার নেতৃত্বে এক দল মুক্তিবাহিনী নড়াইল ট্রেজারী ভেঙে অস্ত্র সংগ্রহ করল। লোহাগড়া স্কুলকে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে পরিণত করা হলো। আরম্ভ হোল মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন। লোহাগড়ায় একটি "স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি" গঠিত হলো। নূর মহাম্মদ মিঞা, আনোয়ারুজ্জামান, ওয়াহিদুর রহমান, লেঃ মতিয়ুর রহমান, আবদুর রফিক সরদার, মোবারক হোসেন মোল্লা, মাহবুবুল হক বিশ্বাস, ওয়ালিয়ার রহমান প্রমুখ এর নেতৃত্বগ্রহণ করলেন। ছুটিতে আসা আর্মি, নেভী, বিডিআর আনসার এবং পুলিশের অবসরপ্রাপ্তরা এ সব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এগিয়ে এল। তাছাড়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, ক্ষেতে কারখানায় কাজ করা শ্রমিকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে এসে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে ভিড় জমাতে লাগল। লক্ষীপাশা ক্লাবে আর একটা ক্যাম্প খোলা হোল। সংগ্রাম কমিটির এ সব কাজে যারা সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, আমীরুজ্জামান, আসাদুজ্জামান, অজয়কান্তি মজুমদার, ফরিদুদ্দীন, ইসহাকমিয়া, বাহাদুর মিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। লোহাগড়া ক্যাম্প থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে মুক্তিযোদ্ধা পাঠানো বেশি সময়সাপেক্ষ বলে নড়াইলে একটা ক্যাম্প স্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। পাকবাহিনী যশোর শহর অবরুদ্ধ করে রাখায় নড়াইলবাসী তখন অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত। বি, এম, মতিয়ুর রহমান কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে স্বীয় বাসভবনে অবস্থান নিয়েছেন। এই সময় নূর মহম্মদ মিঞা, আনোয়ারুজ্জামান, মতিয়ার রহমান প্রমুখ নড়াইল ডাকবাংলোয় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে সেখানে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে নড়াইলের তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক জনাব কামাল সিদ্দিকী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করলেন। এতে নড়াইলে মুক্তিযুদ্ধ নতুন গতি লাভ করল। এসডি ও'র বাস ভবনটি মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে পরিণত হল। এই সময় কমান্ডার খাঁ, হাফিজ, লেঃ মতিয়ুর রহমান ও শাহীদ আলী, জনাব এখলাছুদ্দীন, জনাব আবদুছ সালাম সহ মহকুমার অনেক নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সৃষ্টি করার ফলে বহু সাধারণ মানুষ দলে দলে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের কাতারে শামিল হতে লাগল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যশোর শহরে আক্রমণ পরিচালনা করা হ'ল। পাকবাহিনী বি,ডি,আর ক্যাম্প এবং যশোর শহর ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিল। যশোর শহর আক্রমণের সময় হালকা অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিবাহিনীর পিছনে দা-সড়কি বল্লম এবং তারও পিছনে ঢাল-ঢোল হাতে হাজার হাজার জনতা যেভাবে উৎসাহ দান করছিলো তা জনযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ সৈন্যদের চারদিক থেকে খাদ্য ও পানীয়ের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হল। ক্ষুধায় যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেক খান সেনা বেসামরিক পোশাকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালাতে যেয়ে ধরা পড়ল। এই ভাবে প্রায় বিশজন খান সেনা নড়াইলে

নিহত হয়। চাঁচড়া, চাড়াভিটা নীলগঞ্জ, তারাগঞ্জ এবং যশোরের বিভিআর ক্যাম্প পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করতে থাকল। ক্যান্টনমেন্টের একটা অংশ থেকে বাংগালী সৈন্যরা গোলাগুলীসহ বেরিয়ে এসে এদের সাথে যোগ দিল। কয়েক দিন ধরেই আশা করা হচ্ছিল, যশোর ক্যান্টনমেন্টে শ্বেত পতাকা উড়বে এবং পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু নড়াইল এবং যশোরে উপর্যুপরি বিমান হামলায় এবং ন্যাপাম বোমার আঘাতে টিকতে না পেরে মুক্তিবাহিনী প্রথমে যশোর এবং পরে নড়াইল শহর ত্যাগ করতে বাধ্যহল। দাইতলা ব্রীজে পাকসেনাদের সাথে প্রবল যুদ্ধে নেতৃত্বস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কোলার বশীর আহমদের মৃত্যুর পর ভেঙ্গে যায়। শহরে বা সদর এলাকায় ক্যাম্প রাখা আর সমীচীন নয় বলে পল্লীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং যুদ্ধ প্রবৃত্তি অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলতে থাকল। ইতনায় ক্যাপ্টেন দোহার নেতৃত্বে যে ক্যাম্পটি খোলা হয়েছিল তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জনাব আনোয়ারুজ্জামান আরো বলেন, মে মাসের মাঝামাঝি অবস্থার আরও অবনতি হ'ল। পাকবাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়ে বিভিন্ন গ্রামে–গঞ্জে আগুন জ্বালাতে লাগল, দোকান পাট লুট করতে আরম্ভ করলো এবং অবলীলাক্রমে নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে লাগল। যুবক দেখলেই তারা তাকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করে গুলী করত। অবলা শিশু–নারী এবং বৃদ্ধরাও তাদের বুলেটের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। প্রত্যন্ত গ্রামের লোকেরাও তখন নিদারুণ শোক নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এমতাবস্থায় মুক্তিবাহিনী বাধ্য হল এপার বাংলা ছেড়ে বন্ধুদেশ ওপার বাংলার আশ্রয় নিতে। যুবকরা ঝাকে ঝাকে তাদের পিছু নিল মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে। সেই সাথে আরম্ভ হল দলে দলে বাংগালীর ভিটে মাটির মায়া ত্যাগ করে শরণার্থী হিসাবে ভারতে পাড়ি দেবার পালা।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল। দলে দলে সরকারী কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর জোয়ানও কর্মকর্তা শিক্ষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী আত্মীয় পরিজন বাড়িঘর ফেলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুজিবনগর সরকারের আনুগত্যগ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদিকে মুজিবনগর সরকারের অধীনে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হল। প্রত্যেক কর্মসূচীই স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন দেশ পরিচালনার আদর্শে সঞ্জিবিত। লেঃ মতিয়ার রহমান টালিখোলা এবং পাঁচবাড়িয়া মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ্যাডভোকেট ওয়ালিয়ার রহমান, তবিবর রহমান রুনু, সিরাজুল হক ক্যাম্প পরিচালনায় তাঁর সহকারী ছিলেন। আমিরুজ্জামান একটি মুক্তিযোদ্ধা শিবিরের পলিটিক্যাল মটিভেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আনোয়ারুজ্জামান মুজিবনগরে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহকারী সম্পাদক হিসাবে শরণার্থী শিক্ষকদের নিয়ে ক্যাম্প স্কুল পরিচালনা করেন। আগস্টের মাঝামাঝি এতদঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অংশ ভারতে ট্রেনিং গ্রহণ করে সংগঠিত অবস্থায় লোহাগড়ায় ফিরে আসে। লোহাগড়ার গ্রামাঞ্চলে তখন নক্সালদের দোর্দন্ড প্রতাপ। মার্চ–এপ্রিলের দিকে কিছু যুবক অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় থাকে। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগরে পাড়ি জমাবার পর এরা একটি ভিন্নরূপী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অস্ত্রধারী বলেই এরা নিরীহ লোকদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করে এবং নির্যাতন হত্যা চালিয়ে যায়। কোন

কোন অঞ্চলে নিজেদের শক্তিশালী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। মাগুরার পুলুমের একটি অংশের সাথে মিশে এরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাগমনে বাধা সৃষ্টি করে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও কেড়ে নেয়।

এটা মুক্তিযুদ্ধে এক বড় প্রতিবন্ধকতা মনে করে মুক্তিবাহিনী তাঁদের সাথে সংঘাতে আসতে বাধ্য হয়। ২৭ আগস্ট মহিষাপাড়ায় এবং এর কয়েক দিন পরেই কুমারকাপায় ইউনুস আলী ও আবুল ইসলাম-এর (খোকন) নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ ও দাউদ হোসেনের নেতৃত্বে নক্সালদের এক সংঘর্ষ আঃ রউফ নিহত হয় এবং দাউদের নেতৃত্বে ২১জন নক্সাল অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এর অব্যবহিত পরেই আড়িয়ালা ক্যাম্প থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ইউনুস গগুবে যেয়ে নক্সালদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করলে এর নেতা মমতাজ নিহত হয় এবং তার সহযোগীরা ছত্রভংগ হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে নক্সালরা লাহড়িয়ায় জমা হয়ে এখানে তাদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। সেপ্টেম্বরের শেষ শুক্রবারে ইউনুস, খোকন, মাহমুদ, কানাই, আবদুর রাজ্জাক, আলফাডাংগার হেমায়েত, মাকড়াইলের কবির, কামরুল, লাহড়িয়ার বাদশা মিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিরাট দল কালিগঞ্জ বাজারের পাশে এই নক্সালদের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত গোলাগুলী চলার পর নক্সালরা পরাভূত হয় এবং বরগুনার খসরু ও লাহড়িয়ার আহমদ এই সংঘর্ষে নিহত হয়। কয়েকজন নক্সাল ধরা পড়ে এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

নক্সালদের সাথে মুক্তিবাহিনীর আর একটি বড় সংঘর্ষ হয় কুমড়িতে। যোগীয়ার ইদ্রিস ওয়াকে যত্নর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নক্সালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। লুৎফার হিশামসহ বেশ কয়েকজন এতে যোগ দেন। কিন্তু এ সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। ইদ্রিস আহমদ, কোলার তরুণ ছাত্র ইয়ার আলী, বাতিকাবাড়ির আবদুল মান্নান, কুমড়ির মোশাররফ, তালবাড়িয়ার মহব্বত ও অন্যান্য গ্রামের ৬জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও নক্সাল আহত হয়। এরপর ইউনুস জোরা আক্রমণ চালিয়ে এক সময় ওদের নেতা উজীর আলীকে গ্রেনেডসহ ধরে ফেলে। অন্যান্যরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সার্বিক মুক্তিযুদ্ধে গৌরবজনক ভূমিকা ছাড়াও লোহাগড়া-নড়াইলকে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে লোহাগড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই পাকসেনারা শহরে, গ্রামে ঢুকে জ্বালাও পোড়াও আর লুটতরাজের বিভীষিকা চালিয়ে যায়। নড়াইল ও লোহাগড়া থানায় তারা স্থানীয় লোকদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক লোককে রাজাকার হিসাবে দলে ভিড়ায়। এরা ইয়াহিয়া খাঁনের জল্লাদবাহিনীর সহচর। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কারও সমর্থন আছে জানতে পারলেই তারা তাকে সদরে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করত। এদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হতে লাগলো। ৫ ডিসেম্বর এড়েন্দার কাছে ১০০ বস্তা আলু ও ১৬০ বস্তা গমসহ ওদের সশস্ত্র প্রহরারত রসদের নৌকা এরা আক্রমণ করে খাদ্যদ্রব্য গরীবদের মধ্যে বিতরন করে দেয় এবং লোহাগাড়া থানার সিপাহীদের ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পালন না করায় থানা আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ৭ ডিসেম্বর সকালেই চারদিক থেকে থানাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং আক্রমণ পরিচালনা করা হয় আলতাফ,

আতিয়ার, ইউনুস, খোকন, লুৎফর মাস্টার, লুৎফর বিশ্বাস, আলী মিয়া, শরীফ খসরুসহ অনেকের গ্রুপই এই আক্রমণে অংশ নেয়। ভোর ৫টা থেকে ৯টা পর্যন্ত গোলাগুলী চলার পর থানা আত্মসমর্পণ করে। রাজাকার কমান্ডার কয়াল আরাফতসহ ৭ জন নিহত হয়। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোলার হাবিবুর রহমান অজ্ঞাতনামা আরও ২ জন শাহাদতবরণ করেন। শেষোক্ত একজনকে ইতনায় আর একজনকে বড়দিয়ায় কবর দেওয়া হয়। আমতাংগার আব্দুল মোমেন গাজীসহ অনেকেই আহত হন।

আনোয়ারুজ্জামানের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে, ৮ ডিসেম্বর রাজাকারদের হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হন লোহাগড়া কলেজের ছাত্র মিজানুর রহমান। ঐ রাত্রেই রাজাকারদের সহায়তা দানের অপরাধে লড়াইলের একজন বড় সরকারী কর্মকর্তাকে মুক্তি বাহিনীর আবুগাজী গুলী হকের হত্যা করে। ৯ ডিসেম্বর কুখ্যাত মাওলানা সুলায়মান ও হারুন মোক্তারের রাজাকার বাহিনী এবং রেঞ্জারদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী এক ভীষণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। লড়াইলের জিন্নাহ, আলতাফ, হুমায়ুনসহ অধিকাংশই লোহাগড়ার মুক্তি যোদ্ধাদের আক্রমণ পরিচালনা করে। রাজাকার রেঞ্জাররা সহজেই আত্ম সমর্পণ করল। এ-ছাড়া রূপগঞ্জ ওয়াপদা বাংলোর সামনে ১৯ জন রেঞ্জার বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল। হাওয়াই বাগী ব্রীজ ওড়ানো লোহাগড়া মুক্তি বাহিনীর আর এক উজ্জ্বল কীর্তি।

এতদিন ধরে সহায়ক শক্তির সাথে লড়ার পর এইবার লোহাগড়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি খাঁন সেনাদের সাথে লড়াইয়ের পালা এল। যশোর থেকে পাকসেনাদের গাড়ি ভর্তি সৈন্য, অস্ত্র এবং রসদ লোহাগড়ার উপর দিয়ে ভাটিয়াপাড়ায় পাঠাত। নভেম্বরের শেষে ঈদের দিন সকালে এদের সাথে কালনার রাস্তায় মুক্তিবাহিনীর তুমুল লড়াই হয়। পাকসেনারা রাস্তার উপর এবং মুক্তিবাহিনীরা রাস্তার পার্শ্বে। মাহমুদ মতিয়ার, খোকন ইউনুস, সাজিদ মাহমুদ, মান্নান, মোতাহার, মাছুম, জমাদ্দার, খসরুজ্জামান প্রমুখ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা এ যুদ্ধে অংশ নেন, স্থানীয় লোকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যোগ দেন। যুদ্ধে ৭-৮ জন খাঁন সেনা নিহত হয়। একজন ধরা পড়ে, যাকে কালিয়ায় পাঠানো হয়। এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সাজিদ অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে একটি চাইনিজ এল এম জি ছিনিয়ে আনেন এবং দখিল খাঁন সেনাদের কাছ থেকে যুদ্ধের ম্যাপ উদ্ধার করেন। যুদ্ধে চাচই এর হাবিবুর রহমান এবং কালনার নজরুল ইসলাম শাহাদতবরণ করেন।

ভাটিয়াপাড়াকে পাকসেনারা ছোটখাটো ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে গড়ে তুলেছিল। ওখান থেকে বেরিয়েই হানাদার বাহিনী মধুমতির ওপারে গোপালগঞ্জের একাংশে এবং এপারে লোহাগড়ায় হত্যা নির্যাতন চালাতো। নভেম্বরের মাঝামাঝি মুক্তিবাহিনী একবার ভাটিয়াপাড়া অবরোধ করে। গোপালগঞ্জের হেমায়েত বাহিনী, আঃ মান্নান বীর বিক্রমের বাহিনীর সাথে লোহাগড়ায় মুক্তিবাহিনীর একটি বড় অংশ যোগ দেয়। কিন্তু চারটি বোমারু বিমানের একাধিক হামলায় এবং বোমার আঘাতে মুক্তিবাহিনী ছত্রভংগ হয়ে ফিরে আসে। এর আগে সেপ্টেম্বরের শেষদিকেও একই ভাবে এক বার মুক্তিবাহিনীকে হটে আসতে হয়।

একাধিকবার বিপর্যস্ত হবার পর মুক্তিবাহিনী ভাটিয়াপাড়ায় একটা বড় ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল। ২১ ডিসেম্বর এপার-ওপারের বিশিষ্ট মুক্তিবাহিনী ছাড়াও লেঃ কমল সিদ্দিকী, ক্যাপ্টেন হুদা এবং মেজর মঞ্জুর এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেন। সারাদিন গোলাগুলীর পর কমল সিদ্দিকী গুরুতরভাবে আহত হবার পর মুক্তিবাহিনী ঐ

দিনের মত পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু তাদের মনোবল ভাংগে না। পরদিন ২২ ডিসেম্বর শেষবারের মত হানাদার বাহিনীর উপর মরণ আঘাত হানা হয়। এই জীবন মরণ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা দাউদ বাজার থেকে একজন খাঁন সেনাকে ধরে আনেন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা যুদ্ধের পর খাঁন সেনারা পরাভূত হয়। উভয়পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। মুক্তিবাহিনীর প্রচুর গোলাবারুদ হাতে আসে। ৪৮জন পাঞ্জাবী (১জন নিহত অবস্থায়) এবং একজন বেলুচী সৈন্যকে যশোর পাঠানো হয়। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাটিয়া পাড়া পাক বাহিনীর দখলে ছিল।

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাদেশের সীমান্ত শহর যশোর। নানা দিক থেকে এ জেলার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দেশের একটি অন্যতম প্রধান সেনাশিবির অবস্থিত এবং সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যশোরের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের শুরুতে অর্থাৎ ২৫ মার্চের পরপরই যশোর ক্যান্টনমেন্টের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংগে যশোরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র জনতা সার্বিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করে যে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধের পুরো ন'মাস পাকবাহিনীর দৃ্বৃত্তেরা যশোরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চালিয়েছে তাদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, লুন্ঠন ধর্ষণ আর জ্বালাও পোড়াও অভিযান। পাশাপাশি এই অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিহত করেছে হানাদার বাহিনীর আগ্রাসী তৎপরতা।

যুদ্ধকালিন সময়ে যশোরে পাক বাহিনীর হাতে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন এবং তাদের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন এমন কয়েকজনের বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো। ডাঃ আহাদ আলী খান তাদেরই একজন। স্থানীয় এই বিশিষ্ট চিকিৎসককে পাক বাহিনী গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি সহ্য করেন অবর্ণনীয় অত্যাচার।

একাত্তরের ১৭ জুলাই পাক সৈন্যরা ডাঃ আহাদ আলী খানকে তার চেম্বার থেকে গ্রেফতার করে। স্থানীয় সার্কিট হাউসে নিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেডিয়ার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। প্রথমে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের ফলে তার জ্ঞান হারিয়ে যায়। এক সময় জ্ঞান ফিরলে একজন মেজরের সামনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে একটি ছোট্ট কুঠরি ঘরে রাখা হয় এবং সেখানে তাকে কোন খাবার দেয়া হয় না। এমনকি পানিও না। বাথরুমে যেতে চাইলেও তাকে মারধোর করা হয়।

১৮ একজন মেজর তাকে বলে 'যেহেতু তুমি মেজর মুরশিদ আনোয়ারের মেয়েকে চিকিৎসা করেছিলে সেহেতু তোমাকে একেবারে মেরে ফেলা হয়নি।' সন্ধ্যায় তাকে একমুঠো পঁচা ভাত দেয়া হয় এবং সেই সাথে মাত্র দুই আউন্স পানি। ১৯ তারিখেও একই অবস্থা। ২০ জুলাই পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজন মেজরের কাছে হাজির করা হয়। এই জিজ্ঞাসাবাদের সময়তাকে প্রচণ্ড ভাবে মারধোর করা হয়। ৩১ জুলাই পর্যন্ত তাকে

নিয়মিত দুবেলা মারধোর করা হতো। প্রতিদিন মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হতো পায়খানা, প্রসাব ও গোসল প্রভৃতি কাজের জন্য। সময়ের হেরে ফের হলে পেছন থেকে শুরু হতো বেত মারা। প্রতিদিন খাবার পানি বরাদ্দ মাত্র দুই টাইম। অতিরিক্ত পানি চাইলে দস্যুরা প্রস্রাব করে দিতো। এ সময় অন্যান্য যারা ছিল তাদের মধ্যে নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন, ডাঃ মাহবুবুর রহমান, আজিজুল হক বদরুল আলমের নাম উল্লেখযোগ্য।
ক্যান্টনমেন্টে থাকাকালিন সময়ে তিনি প্রতিদিন দেখতে পেতেন রাত্রি ৯টার দিকে বন্দীদের মধ্যে থেকে দশ/পনোরো জন করে চোখে কালো কাপড় বেধে নিয়ে যাওয়া হোত এবং তাদেরকে জবাই করে হত্যা করা হতো। দিনের বেলা সন্দেহ ভাজন লোকদের ধরে এনে পা উপরে বেধে ঝুলন্ত অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করা হতো। এইসব বন্দীদের মলদ্বার দিয়ে বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেয়া হোত। আবার অনেককে তথ্য আদায়ের নামে পেছন দিয়ে বরফ খণ্ড ঢুকিয়ে দিত। এধরনের অমানবিক অত্যাচারের নির্মম শিকার ছিলেন বাগআচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। সবার সামনেই পাক সৈন্যরা বিভিন্ন কৌশলে প্রতিদিন বন্দীদের নির্যাতন চালাতো। অনেক সময় এই নির্যাতন কালিন সময়েই অনেকে মৃত্যুবরণ করতো। নির্যাতনের একটি কৌশল ছিলো বন্দীদের ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে ইলেকটিক সক প্রয়োগ করা এবং হাত পায়ের নখে লৌহ শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া।
বিভিন্ন সময়ে সৈন্যরা বাইরে থেকে মেয়েদের ধরে আনতো। এসব মেয়েদের কারো কারো সংগে কচি দুধের বাচ্চাও থাকতো। এইসব শিশুকে সৈন্যরা মায়ের বুকে বসিয়ে বেয়োনট দিয়ে খুচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতো। তারপর সেই সব মেয়েদের উপর ধর্ষণে লিপ্ত হতো পশুরা। কখনও কখনও পাকবাহিনী বন্দীদের কাছ থেকে জোর করে 'পাকিস্তানে ভালো আছি' একথা বলিয়ে তা রেকর্ড করতো, তারপর দেখা যেত সেই বন্দীকে তখনি হত্যা করতো। কোন কোন বন্দীকে সৈনরা হাত পা বেঁধে ছাদের উপর তুলে নিয়ে সোজা নিচে ছেড়ে দিতো আবার কখনো দেখা যেত কাউকে শারিরীকভাবে নির্যাতন না করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীর থেকে হাত কিংবা পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। যেসব পাকিস্তানী অফিসার এই অমানবিক কর্মকাণ্ডে সিপাহীদের উৎসাহ যোগাতো তাদের মধ্যে কর্ণেল সামস ও মেজর বেলায়েতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই পাক পাষণ্ড অফিসার আবার মেয়েদের উপর বিভিন্ন কৌশলে অত্যাচার চালাতো। এরা স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধরে ধর্ষণ করতো। প্রতিদিনিই ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এবং শহরে আকষ্মিক অভিযান চালিয়ে বহু মেয়েকে এরা ধরে আনতো।
প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ চুরাশী পর্ব অবিভক্ত বৃহত্তর যশোর জেলার একটি মহকুমা ছিলো ঝিনেদা যা বর্তমানে একটি জেলা। এ জেলার একেবারে সীমান্ত ঘেষা একটি উপজেলার নাম মহেশপুর। এই উপজেলার একজন অধিবাসী দেবাশীষ দাস। যিনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এখানে তার কথা তুলে ধরা হলো।
মহেশপুর থানা থেকে একটি কাঁচা রাস্তা বর্ডার পর্যন্ত গিয়েছে। হাসপাতালটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। হাসপাতালের সামনে একটি খেলার মাঠ, পূর্বে মুচিবাড়ী, পশ্চিমে বাজার, উত্তরে সরকারী রাস্তা এবং ঐ রাস্তার উপরে পুল, পুলের নিচে নদী। '৭১ সালে পাকসেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কালীগঞ্জ, কোট চাঁদপুর ও খালিশপুর হয়ে মহেশপুরে চলে

আসে। এখানে এসে তারা হাসপাতালে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং সৈন্যদের কিছু অংশ থানায় অবস্থান নেয়। এখানে ঘাঁটি স্থাপনের পরপরই তারা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিতে আরম্ভ করে। এই কাজে তাদের সহযোগিতা করে স্থানীয় মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামীর লোকজন। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া ছাড়াও তারা বাড়ী বাড়ী থেকে মালামাল লুট করে। এসময় তারা যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ যুদ্ধকালিন সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাকীরা ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। পাক সৈন্যরা প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে ধরে আনতো। এইসব লোকদের সৈন্যরা হাসপাতলের একটি কক্ষে আটক রেখে নির্যাতন চালাতো। মহেশপুরে পাক সৈন্যদের প্লাটুন কমাণ্ডার ছিলো মেজর আনিছ খান। সৈন্যরা মহেশপুর, কোট চাঁদপুর, কালীগঞ্জ বারোবাজার, খালীশপুর, চৌগাছা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লোকজন ধরে আনতো। ধৃত লোকদের অনেককে সংগে সংগে গুলি করে মারা হোত। আবার কাউকে নির্যাতন কক্ষেবন্দী করে রাখা হতো। সেখান থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কয়েক জন করে বের করে নিয়ে হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে তাদের দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়ে তারপর তার মধ্যে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করতো। তারপর অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো। আবার কোন কোন দিন বন্দীদের গর্তের মধ্যে চিৎ করে শুইয়ে সোজা জবাই করা হতো। কখনো বেয়োনেট চার্জ করে মারা হতো।

পাক বাহিনীর এই জ্বালাও পোড়াও অভিযানে সহযোগিতা করতো স্থানীয় দালাল ও রাজাকার বাহিনী। যেদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে অধিক সংখ্যায় মানুষ ধরে আনা হতো সেদিন বন্দীদের দিয়ে একটি বৃহৎ গর্ত খোড়ানো হতো। তারপর সেই গর্তে তাদের লাইন ধরে শুইয়ে তার উপর বাবলার কাটা বিছিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের মাটি চাপা দেয়া হতো। পাক সৈন্যরা আরো যেসব অভিনব উপায়ে মানুষ হত্যা করতো তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেদিন তারা শক্ত সামর্থ যুবকদের ধরে আনতো সেদিন হাসপাতালের ভেতরে রেখে তাদের শরীর থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বের করে নিত এবং যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ করতো ততক্ষণ সেখানে ফেলে রাখা হতো।

পাকবাহিনী বিভিন্ন গ্রাম থেকে জামাত ও রাজাকার সহকর্মীদের সহযোগিতায় কিশোরী, যুবতী ও গৃহ বধুদের ধরে আনতো। এইসব মেয়েদের উপর তারা বিভিন্ন কৌশলে পাশবিক অত্যাচার চালাতো। একদিন ভারতগামি একদল শরনার্থীকে হত্যা করে তাদের মধ্যে থেকে প্রায় ১৫ জন যুবতী-কিশোরী মেয়েকে তাদের পরনের কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলংগ অবস্থায় কয়েক মাইল হাঁটিয়ে মহেশপুরে নিয়ে আসে। এখানে এইসব মেয়েদের তারা যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত আটকে রেখে ধর্ষণ করে। প্রতিদিন মুক্তিবাহিনী কিংবা তাদের চর হিসেবে যাদের সন্দেহ করে ধরে আনা হতো তাদের সবাই থাকত যুবক শ্রেণীর। দীর্ঘ সময় ধরে এইসব যুবকদের উপর নির্যাতন করা হতো। কারো হাত-পায়ের নখ তুলে ফেলা হতো। কারো নখের ভেতর খেজুরের কাঁটা ঢুকিয়ে দেয়া হতো। কারো চোখের ভেতর লোহার পেরেক বসিয়ে দেয়া হতো। তারপর এইসব যুবকদের জীবন্ত অবস্থায় হাত পা বেঁধে কখনও বা বস্তায় পুরে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস ধরে পাক সেনারা এইভাবে নড়াইল, ঝিনেদা ও মাগুরাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে।

চৌগাছা থানাতেও ক্যাম্প স্থাপন করে পাক পশুরা দালালদের সহায়তায় একই উপায়ে মানুষ হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ চালিয়েছে। এখানকার ডাক বাংলোতে ছিল পাক বাহিনীর ক্যাম্প। বাংলোর পেছনে বন্দীদের দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়ে তার ভেতরে এক সংগে ২০/২৫ জন করে মেরে পুতে রাখতো।
একমাত্র বাংলোর পেছনেই সৈন্যরা এরকম প্রায় ৮০/৯০ টি গর্তে মানুষ হত্যা করে পুতে রেখেছিলো। সে গর্তগুলো ১৬ ডিসেম্বরের পর আবিষ্কৃত হয়। একদিন এখানে ১০/১৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে আনা হয়। এই ছেলেদের সমস্ত রাত ধরে পিটিয়ে পরদিন সকাল বেলা প্রকাশ্য রাস্তার উপর গাছ পা উপরে বেঁধে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়। চৌগাছা থানাটি সীমান্ত এলাকা থাকায় প্রতিদিন এখানে যেসব মানুষ ধরা পড়ে মৃত্যু বরণ করতো তার বেশীর ভাগই থাকতো ভারতগামী শরনার্থীদের।
যশোর ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী মনোহরপুর গ্রামের আমীর হোসেন মুক্তিবাহিনীর তথ্য সরবরাহের কাজ করতেন। একারণে ধরা পড়ে চারমাস হানাদারদের শিবির কাটাবার পর সৌভাগ্যক্রমে ছাড়া পান। ছাড়া পাবার পর আমীর হোসেনের কাছ থেকে জানা যায় ক্যান্টনমেন্টের অসংখ্য হত্যাযজ্ঞের কাহিনী। তিনি বলেন, সেভেন ফিল্ড এমবুলেন্সের ওসি লেঃ কর্ণেল আঃ হাইয়ের লাশ হত্যার দু'দিন পর আনা হয় সি, এম, এইচ এ। তার লাশ পাওয়া যায় গ্যারিসন সিনেমা হল সংলগ্ন পশ্চিম দিকের তালতলায়। তার পেটে সতেরোটি বুলেটের চিহ্ন ছিল। এই কোম্পানীর কোয়ার্টার মাষ্টার ক্যাপ্টেন শেখের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটেছিল।
আমীর হোসেন আরো জানালেন, সি এম এইচ-এর নার্সিংচীফ হাবিলদার আঃ খালেক এবং তার সঙ্গী যহুর আলী ও অন্য একজন সুবেদার এম আই রুমে ঔষধ আনতে যাওয়ার পথে রানওয়ের নিকটবর্তী দোকানগুলোর কাছে খান সেনারা তাদের গুলি করে হত্যা করে। এসময় তারা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদের ইমামকেও গুলি করে মারে। হত্যার আগে দুস্যুরা ইমাম সাহেবকে কৌতুক করে কলেমা পড়তে বলে। তখন জনৈক দস্যু মুখ বিকৃত করে বলে 'শালা গান্দার মাওলানা কলেমাভী পড়নে নেহী সাক্তা'।
পাক বাহিনী হত্যার জন্য বাঙালীদের ধরে এনে প্রথমে আই এম আই অতঃপর সেখান থেকে ৬১৪ এম আই ইউ এবং পরে ৪০৯ জি এইচ কিউতে পাঠিয়ে দিত। ৬১৪ এম আই ইউতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বন্দীদের কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। এম, ই এসের একজন কর্মচারী হারেস উদ্দিন জানান, ৩০ মার্চ তিনি গ্রেফতার হন। ১৪ দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে রেখে পাক জল্লাদেরা তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তার কাছ থেকে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত তৎকালীন সামরিক বাহিনীর বাঙালী অফিসার কর্মচারীদের স্ত্রী কন্যাদের একটি বন্দী শিবীরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জানান, ৫৫ নং ফিল্ড রেজিমেন্টের আর্টিলারির ফ্যামিলি কোয়ার্টারে ১২ থেকে ৪৬ বছর বয়স পর্যন্ত ২৫৫ জন মেয়েকে আটকে রেখে প্রতি রাতে অসংখ্য পাক দস্যু তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতো। তার সেলটি কাছাকাছি হওয়ায় প্রতি রাতে তিনি মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতে পেতেন। সেই সাথে বর্বর পাক দুস্যদের পৈচাশিক হাসি ভেসে আসতো। সব কিছু মিলেমিশে এক মর্ম বিদারী অবস্থার সৃষ্টি হতো।
প্রতিদিন বিকেলে একজন সুবেদার এসে বন্দী মেয়েদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতো। সন্ধ্যা হলে কে কোথায় যাবে সে অনুযায়ী তাদের উক্তি লিষ্ট অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে

মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হতো। কখনও কখনও আপন খেয়াল খুশীতে বাইরের কোন মেয়েকে এনে শুরু কোরত ধর্ষণ। পাহারারত কুকুরের দল পালাক্রমে একজনকেই উপর্যপুরী অত্যাচার করতো। একদিন একটি মেয়েকে পর পর পনেরোজন পশু অত্যাচার চালানোর পরে সে মৃত্যুবরণ করে। অজ্ঞান অবস্থাতেও পশুরা তাকে ধর্ষণ করে। জনাব হারেছকে চৌদ্দদিন পরে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর জেলাখানা থেকে জরুরী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে পুনরায় ক্যান্টনমেন্টে আনা হয়। এসময় তাকে এফ, আই, ইউতে রেখে কঠোরভাবে অত্যাচার করা হয়। সেখানে তিনি ১২ নং ব্যারাকের ১০নং রুমে প্রায় পঞ্চাশজন মহিলাকে দেখতে পান। হারেছ উদ্দিন আরো বলেন বন্দী শিবিরে মেয়েদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হতো। প্রথম ভাগে থাকতো কিশোরী, দ্বিতীয় ভাগে থাকতো যুবতী এবং তৃতীয় বাগে থাকতো গৃহ বধু বা মধ্য বয়সী মহিলারা। তিনি স্কুল কলেজের কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের প্রতিদিন বিমানে করে ঢাকায় পাঠাতে দেখেছেন। দখলদাররা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আন্ডার গ্রাউন্ড সেল তৈরী করেছিল। যশোর পতনের পর এমনি দুটি সেল থেকে কয়েকশ বন্দীকে উদ্ধার করা হয়। সবাই জীবিত থাকলেও অসম্ভব নির্যাতনের ফলে তাদের মধ্যে প্রাণ ছিল না। বেশীর ভাগ পাগলে পরিণত হয়েছিল।

আলো বাতাশ ও খাদ্যহীন অবস্থায় এসব কংকালসার মানুষ কেবল এক রাশ যন্ত্রণার বোঝা বহন করছিল। এসময় ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন কক্ষ থেকে কয়েকশ মহিলাকে উদ্ধার করা হয় যারা যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত শত্রুদের পাশবিকতার শিকার হয়েছে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার বুকে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের খবর যখন ঝিনাইদহ পৌঁছালো তখন সেখানকার জনসাধারণের সাথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরাও দেশের জন্য সংগ্রাম করার দৃঢ় শপথ নেন। অধ্যাপক গোলাম জিলানী, অধ্যাপক আব্দুল হাকিম খান ও অধ্যাপক শফিকুল্লার নেতৃত্বে ক্যাডেট কলেজ প্রতিরক্ষাদল গঠন করা হয় এবং ঝিনাইদহের এসডিপি ও জনাব মাহবুব উদ্দীন এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ৩০ মার্চ গভীর রাতে কুষ্টিয়া থেকে পাকবাহিনীর ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টের ১ কোম্পানী সৈন্য ঝিনাইদহে তাদের হিংস্র নখরাঘাতের জন্য মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদর্পে এগুচ্ছিল। তখন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের এই বীরেরা তাদের গতি প্রতিহত করে।

১ এপ্রিল পুনরায় যশোর থেকে পাক সৈন্যরা নোতুন করে ঝিনাইদহ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সেদিনও ঝিনাইদহের ছয় মাইল দূরে বিষয়খালীতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদের পর্যদুস্ত করে আতেও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের ব্যাপক অবদান ছিলো। শুধু যুদ্ধ করাই নয়, নোতুনদের যুদ্ধে শিক্ষা দেওয়া, সংবাদ সরবরাহ, মুক্তিবাহিনীর রসদ যোগানোর দায়িত্বও নেয় এ কলেজের কর্মচারীরা। ৫শ মুক্তিযোদ্ধার খাবার তৈরীর ভারও ছিল তাদের উপর। এদিকে হানাদার বাহিনী বিভিন্নস্থানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় প্রতিদিনই বিমানযোগে যশোরে প্রচুর গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও নোতুন সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এ সময় এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীকে ক্রোজ করে নেওয়া হয়। অরক্ষিত ঝিনাইদহে পাকবাহিনী বীরদর্পে প্রবেশ করে ১৬ এপ্রিল।

১৮ এপ্রিল। অধ্যক্ষ জনাব রহমান, অধ্যাপক হাকিম খান, বাবুর্চী আবুল ফজল ও

হসপিটাল এ্যাটেনড্যান্ট শামসুল আলম ছাড়া কলেজে আর কেউ নাই। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে। একটা থমথমে ভাব। মাঝে মাঝে নীরবতা ভেঙে ঝিনাইদহ–কুষ্টিয়া সড়কে দ্রুতগামী আর্মি গাড়ীর আওয়াজ। একটা অমঙ্গলের ছাপ যেন চারদিকে বিরাজ করছে। সবেমাত্র অধ্যক্ষ কর্ণেল রহমান ও অধ্যাপক হালিম খান দুপুরে খাবার খেয়ে অধ্যক্ষের বাংলোর উপর তলায় বিশ্রামের জন্য গেছেন এমন সময় ১নং গেট ভেঙে কয়েকটা আর্মি ট্রাক কলেজ গ্রাউণ্ডে ঢুকে পড়ে এবং অধ্যক্ষের বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়। এই দলটি এসেছিল কুষ্টিয়া থেকে। এদের অধিনায়ক ছিল ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইকবাল। এই নরপিশাচের আদেশে জোওয়ানরা অধ্যক্ষ কর্ণেল রহমান, অধ্যাপক হালিম খান ও বাবুর্চী আবুল কজলকে ঘর থেকে বের করে গেটের বাইরে নিয়ে যায়। হানাদার বাহিনীর সাথে ছিল তাদের চর কয়েকজন বিহারী। এদের মধ্যে সব চাইতে জঘন্য ছিল ঝিনাইদহের টমেটো নামে কুখ্যাত একজন বিহারী। এই নরপিশাচ অধ্যক্ষ কর্ণেল রহমান ও অধ্যাপক হালিম খানের নামে তার পরিবারবর্গ নিধনের মিথ্যে অপবাদ দেয়। আর মিথ্যে অপবাদের উপর ভিত্তি করেই ক্যাপ্টেন ইকবাল তার অনুচরদের হাতে ছেড়ে দেয় অধ্যাপক হালিম খানকে। অধ্যক্ষের বাংলোর পেছন দিকে এরা অসহায় হালিম খানকে বেয়োনেট আর তলোয়ারের নির্মম আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করে। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে কর্ণেলের কথা কটাকাটি হয়। অধ্যক্ষ কর্ণেল বলেন "আমিও আর্মি অফিসার, আমাকে এভাবে মারা অন্যায়। আমার অপরাধের বিচার একমাত্র সামরিক আদালতই করতে পারে। তাছাড়া একজন আর্মি কর্ণেল, একজন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদা আমাকে দেওয়া হচ্ছে না কেন?" কিন্তু এই নরপিশাচদের কাছে সকল যুক্তিই বৃথা। তার কাছ থেকে ঘড়ি টাকা চাবি সব কেড়ে নেওয়া হলো। সৈন্যরা কলেজের মুল্যবান জিনিষপত্র ট্রাকে তুলে যখন উল্লাস করতে করতে ২ নং গেট দিয়ে বের হচ্ছিল সে সময় তাদের নজর পড়ে গেটে কর্তব্যরত মালী সাত্তারের উপর। তাকে ধরে নিয়ে ড্রেনের পাশে দাঁড় করিয়ে পরপর দুটি গুলি করে হত্যা করে। গুলি দুটো তার দেহ ভেদ করে দেয়ালে বিদ্ধ হয়। তার দেহ গড়িয়ে পড়ে ড্রেনের মধ্যে। হতভাগ্য চৌকিদার মইজদ্দীকে ধরে নিয়ে কুষ্টিয়া সড়কের পুলের তলায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচারে দেশত্যাগি এক কোটি শরণার্থীকে অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান দিয়েই কেবল সাহায্যে করেছিলো তাই নয়– তারা সশস্ত্র যুদ্ধেও সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত মুক্ত করেছিলো। মিত্রবাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৎকালিন ভূমিকা সম্পর্কে 'বাংলা নামে দেশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে–

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। মধ্যরাত্রি থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেল ভারত–পাক যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করল ভারতীয় সেনা, বিমান

এবং নৌবাহিনী। আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। এপ্রিল-মে থেকেই ভারতীয় এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছিল। লক্ষ্যটা স্থির করে দেন রাষ্ট্রনায়করা।

এপ্রিল মাসের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটা দিক তুলে ধরে বলেছিলেনঃ (এক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাবে মূলত বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করবে। (দুই) মুক্তিবাহিনীকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে বলে পাকবাহিনী যদি ভারতের উপর হামলা করে তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেই আক্রমণের জবাব দিতে হবে। (তিন) বাংলাদেশ সমস্যার যদি কোনও রাজনৈতিক সমাধান না হয় তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। (চার) যদি চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামতে হয়ই তাহলে তার লক্ষ্য হবে রাজধানী ঢাকাসহ গোটা বাংলাদেশকে দখলদার পাক বাহিনীর কবলমুক্ত করা। (পাঁচ) মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে তাহলে রাজধানীসহ গোটা বাংলাদেশকে খুব দ্রুতগতিতে মুক্ত করতে হবে। (ছয়) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অংশ নেওয়া মানেই হবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। সুতরাং লড়াই শুধু পূর্বে হবে না, হবে পশ্চিমেও এবং (সাত) পাক-ভারত লড়াই হলে উত্তর সীমান্তে চীনের কথাও মনে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রথমেই কতকগুলি অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশে অসংখ্য নদীনালা। কতকগুলি নদী বিশাল। আর, দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদীনালাগুলি অধিকাংশই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। তাই পশ্চিম থেকে পূর্বে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ ভারত থেকে বাংলাদেশের কোনও বড় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে হলে নানা কারণে পশ্চিম দিক থেকে পাঠানোই সুবিধা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাস্তাঘাট অত্যন্ত কম। সেগুলিও অসংখ্য নদীনালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ-বোট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীতে মোট সৈন্য এবং আমার সৈন্য প্রায় চার ডিভিশন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত ঘাঁটি থেকে কোনও সেনাবাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে আক্রমণকারীর অন্তত তিনগুণ শক্তি চাই। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য অন্তত বারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য প্রয়োজন। অথচ তা পাওয়া যাবে না। কারণ, পশ্চিম খণ্ডেও বহু সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ রাখা প্রয়োজন। আর, উত্তরের জন্যও কিছু সৈন্য এবং বিমান মজুত রাখতে হবে। পঞ্চমত, এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব দ্রুত ঢাকাসহ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে-কিন্তু বাংলাদেশে এমন সতর্কভাবে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি না হয়, দেশের কোনও সম্পদ ধ্বংস না হয় এবং লড়াইটা চলে শুধু পাক বাহিনীর সঙ্গে। অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করতে হবে, কিন্তু আর পাঁচটা লড়াইয়ের মত সর্বাত্মক লড়াই করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করল। সেই পরিকল্পনার পাঁচটা লক্ষ্য। প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ক্ষিপ্রতা।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী স্থির করল যদি যুদ্ধে নামতেই হয় তাহলে দু সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা পৌঁছাতে হবে। অন্যান্য শহর বা ঘাঁটি দখলের জন্য সময় বা শক্তি নষ্ট করা হবে না। সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে হবে।
দ্বিতীয় লক্ষ্য, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে তার চেয়ে অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করছে। আর তাকে দেখাতে হবে যে ভারতীয় বাহিনী সবদিক থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে যাতে শত্রুপক্ষ আর সৈন্যবাহিনী কোনও একটা এলাকায় জড় না করতে পারে এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়। তৃতীয় লক্ষ্য, সেই ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনীকে আবার একত্রিত হতে না দেওয়া–এতে পাকবাহিনী রিক্তপুষ্ট হয়ে কোনও দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে না নামতে পারে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তারা ঢাকা রক্ষার জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও শক্তব্যুহ না রচনা করতে পারে।
চতুর্থ লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনী যাতে পাকবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনও বড় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং যেন ভারতীয় বাহিনীর ক্ষতি যথাসম্ভব কম হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পরিচালকরা এটাও জানতেন যে কোথাও কোন বড় দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হলে তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে এবং জাতীয় সম্পদও ধ্বংস হতে বাধ্য। এইজন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথম থেকেই ঠিক করল বাংলাদেশে ঢুকতে হলে বড় সড়কগুলি এড়িয়ে যাবে এবং এগোবে কাঁচা পথ দিয়ে–যেখানে পাকবাহিনী প্রতিরক্ষাব্যুহ বা মাইন থাকবে না, যেখানে শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না এবং যেখানে জনবসতি খুবই কম থাকবে। পঞ্চম লক্ষ্য গোড়া থেকেই এমনভাবে আক্রমণটা চালানো এবং পরিচালনা করা যাতে বাংলাদেশের দখলদার পাক–বাহিনীর মনোবল লড়াইয়ের প্রায় শুরুতেই ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং যাতে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই পাঁচটা লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশের প্রায় চতুর্দিকে এইভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালো।
২নং কোর। সদর দফতর–কৃষ্ণনগর। প্রধান–লেঃ জেঃ টি, এন, রায়না। দুটো পার্বত্য ডিভিশন। ৯ম ও ৪র্থ। তৎসহ টি–৫৫ এস রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত কেটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্টে, পিটি–৭৬, সাতারু রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত আর এক হাল্কা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে, একটা মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্টে–১৩০ মিলিমিটার দূরপাল্লার রুশ কামানসহ ব্রিজ তৈরী করতে পারে এমন একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ৯ম ডিভিশন তার প্রধান ঘাঁটি করল ২৪ পরগনার বয়রার কাছাকাছি। ডিভিশনের মূল ঘাঁটি হল কৃষ্ণনগর। ৩৩নং কোর। সদর দফতর–শিলিগুড়ি। প্রধান–লেঃ জেঃ এল, এল, থাপান ৬ এবং ২০নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ পিটি–৭৬ এর ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, বৃটিশ ৫৫´ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটি মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরি করার একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ২০ নং পার্বত্য ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি করল বালুরঘাটের কাছে। ৬নং ডিভিশন কোচবিহার জেলায়। এই ৩৩নং কোরের আর একটা অংশের ঘাঁটি হল গোহাটিতে। পরিচিতিঃ ১০১ নং কমিউনিকেশন জোন। প্রধানঃ মেঃ জেঃ জি, এস, গিল। শক্তিঃ দুই ব্রিগেড পদাতিক সৈন্য। জামালপুরের কাছে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ে জেনারেল গিল আহত হওয়ার পর এই বাহিনীর প্রধান হলেন মেঃ জেঃ জি, নাগরা। ৪নং কোর। সদর দফতর–আগরতলা। প্রধান–লেঃ জেঃ সগত সিং। ৮, ৫৭ এবং ২৩ নং

পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ দু' স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ এস রুশ সাঁতারু ট্যাঙ্ক বৃটিশ ৫.৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটা মাঝারি রেজিমেন্ট এবং ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ঐ তিনটি পার্বত্য ডিভিশনকে ভাগ ভাগ করে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন এলাকার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

এর সঙ্গে ছিল কর্ণেল ওসমানির অধীনস্থ প্রায় ৭০,০০০ মুক্তিসেনা। মুক্তি-মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা নব পর্বায়ে জুন মাস থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে লড়াই চালাতে শুরু করেছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মেঃ জেঃ বি,এন, সরকার। বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান হলেন লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা। ভারত বাংলাদেশের চতুর্দিকে যে সৈন্য সাজালো তারা অধিকাংশই পার্বত্য ডিভিশনের। পার্বত্য ডিভিশন গঠন যে কোনও অন্য ডিভিশনের মতই, কিন্তু যেহেতু প্রধানত পাহাড়ে লড়াই করার জন্য পার্বত্য ডিভিশন গঠিত হয় সেইজন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় একটু হাল্কা ধরণের। ট্যাঙ্ক বা ভারী কামান পার্বত্য ডিভিশনে থাকে না। এই জন্যই বাংলাদেশে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বাড়তি ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারি রেজিমেন্ট যোগ করে। এর মধ্যে বেশকিছু রাশিয়ান সাঁতারু ট্যাঙ্কও ছিল। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে সাধারণত বড় ব্রীজ তৈরী করার মত ইউনিট থাকে না। কারণ, পাহাড়ের উপরে নদী চওড়া হয় না। অথচ বাংলাদেশ চওড়া নদীতে ভরা। কতকগুলি নদী বিশাল। এইজন্য বাংলাদেশে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বড় বড় ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিটও দেওয়া হল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের জন্য তিন পর্যায়ে তিন কিস্তি সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করে। প্রথম পর্যায়, ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের পাকিস্তানী সামরিক পরিকল্পনা ছিল সমস্ত শহরগুলিতে বাঙালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়, যাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় তাকেই শেষ করে দাও। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন ট্রেনিংসহ পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় আক্রমণ শুরু করল তখন পাক বাহিনীও বাংলাদেশে তার সামরিক পরিকল্পনা পাল্টালো। এই পর্যায়ে তারা শুধু সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করল না। গড়ে তুলল দুটো স্থানীয় বাহিনীও। এর একটা হল রাজাকার বাহিনী-সামান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত অত্যাচারীর দল। আর একটা আলবদর বাহিনী-প্রধানত ধর্মান্ধ যুবক এবং গুন্ডা শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত অসামরিক বাহিনী। গেরিলা এবং পাক-বিরোধীদের খতম করার জন্য পাক সামরিক বাহিনী এই দুই দালাল বাহিনীর সাহায্য নিল। রাজাকার বাহিনীর হাতে অস্ত্রও দেওয়া হল-প্রধানত রাইফেল। নানা রকমের দায়িত্ব পেল তারা। যেমন, গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সহকারী এবং আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো ও তাদের নাম-ধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা, ব্রিজ-রেললাইন ইত্যাদি পাহারা দেওয়া। আলবদর বাহিনীকেও মোটামুটি একই রকমের দায়িত্ব পেল শহর অঞ্চলে। শহরে এবং শহরের আশেপাশে যারা যারা পাকিস্তান বিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর। সেনাবাহিনী এই দুই বাহিনীর কাজকর্ম নিয়মিত তদারক করত। এই দুই বাহিনীকেই সেনাবাহিনী ঢালাও সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ যত বাড়তে আরম্ভ করল পাক কর্তৃপক্ষও ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ বাঙ্গালীর উপর সেনাবাহিনী ও তার দুই দালাল গোষ্ঠির অত্যাচারও ততই বেড়ে চলল। একদিকে যখন সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার বাড়ল অন্যদিকে তখনই পাক সেনাবাহিনী সীমান্তেই মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারত--বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করল। বর্ষাকালে এই কাজে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু বর্ষা একটু কমতেই তারা রাজাকারদের নিয়ে সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করল। সেপ্টেম্বর নাগাদ এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। ২৭৪টা সীমান্ত চৌকির মধ্যে ওরা প্রায় ২১০টায় পৌঁছে গেল। ২৫ মার্চের পর পাক ফৌজ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে প্রায় সব সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এইরকম সময়ে পাক রাষ্ট্রনায়করা ঢাকার কর্তৃপক্ষের জন্য আবার তাদের নতুন নির্দেশাবলী পাঠাল। এই নির্দেশাবলীর প্রথম ভাগটা ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাক কর্তৃপক্ষ বলল: 'আমরা মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করবে এবং ভারত সরকার সেই দখল করা এলাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার নামক তন্ত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর সেই তথাকথিত স্বাধীন বাংলা সরকার দেখিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে হয় ভারত সরকার গোটা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। সে সাহস তারা পাবে না। তারা চাইবে সীমান্তের কাছাকাছি কয়েকটা বড় শহরকে নিয়ে একটা তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠন করতে।' এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ ঢাকাকে নির্দেশ দিল: 'সুতরাং এমনভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে যাতে ওরা পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বড় এলাকা না দখল করতে পারে। আমদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তেই সুদৃঢ় করতে হবে এবং দেখতে হবে যেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী স্বনামে বা বেনামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলে ঢুকে তা না দখল করতে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে এক আধ মাইল ওরা ঢুকে পড়লে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বেশী দূর কিছুতেই এগোতে দেওয়া হবে না।'

এই নির্দেশ পেয়েই বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজি বোঝার চেষ্টা করল ভারতীয় বাহিনী কোন দিকটায় ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। নানাভাবে খবর নিল। পাত্রমিত্রদের নিয়ে বার বার পরামর্শ করল। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী কোন দিক দিয়ে এগিয়ে কোন এলাকা মুক্ত করতে চাইতে পারে। ততদিন সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজি সব দিকের খবর নিল এবং দেখল চতুর্দিকে প্রস্তুতি। যে কোনও দিক দিয়ে আক্রমণ হতে পারে। এই অবস্থায় নিয়াজি একটা 'মাষ্টার প্ল্যান' তৈরী করল। তাঁর পরিকল্পনাটা হল এই রকম: সীমান্তের সবগুলি পাকা রাস্তার উপর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা হবে। ভারতীয় বাহিনী যেখানে জড় হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে তাতে ভারী কামান সহ পাকসেনাদের বসিয়ে দেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়েই ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক সেই রাস্তাতেই তাকে বাধা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে পাক সেনাবাহিনী। আর অন্যান্য আধা সৈনিকরা লড়বে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে। পরিকল্পনা পাকা হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই নিয়াজি তার গোটা সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে দশ-পনেরো মাইল, কোথাও কোথাও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করল এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটির মুখোমুখি ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক সহ পাক সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাই দেখে ভীষণ খুশি হলেন। তারা বুঝলেন পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। নিয়াজি তার সেনাবাহিনীকে দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, গোটা সীমান্তটা রক্ষা করতে চাইছে এবং বুঝতে পারছে না যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কোন দিক দিয়ে এগোবে। বাংলাদেশে নিয়াজির হাতে তখন পাক সেনাবাহিনীর প্রায় ৪২টা নিয়মিত ব্যাটালিয়ন। ৩৫ ব্যাটালিয়ন পাকসেনা এবং ৭ ব্যাটালিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানী রেঞ্জার্স। আর আধা সামরিকদের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আরমড ফোরসেসের ১৭টা উইংগ এবং ৫ উইংগ মোজাহেদ। অর্থাৎ মোট নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৪০,০০০। আধা সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৪,২০০ লোক। এছাড়াও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে বাংলাদেশেও আরও প্রায় ২৪,০০০ ইনডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ছিল। মোট সৈন্য ছিল মাত্র ৪২ ব্যাটালিয়ন। কিন্তু নামে ডিভিশন ছিল চারটা। ১৪, ৩৯, ৯ ও ১৬। এছাড়াও ৩৬নং ডিভিশন নামে আর একটা ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল জামসেদের অধীনে। প্রধানত আধা-সৈনিকরা এই ডিভিশনের আওতায় ছিল।

সীমান্তের চতুর্দিকে এই বাহিনীকে সাজিয়ে দিয়ে নিয়াজি বেশ একটু পরিতৃপ্ত হলেন। তার হাতে তখন গুলিগোলাও প্রচুর। নিয়াজি যত সৈন্য চেয়েছিল পাক কর্তৃপক্ষ কখনও তা তাকে দেয়নি, তার চাহিদা মত ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেনি। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা নিয়াজিকে গোলাবারুদ দিতে কোন কার্পণ্য করেনি। যা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশি দিয়েছিল। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠান প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে। নিয়াজির নবম ডিভিশন তখন যশোরের ঘাঁটিতে। নবম ডিভিশনের সৈন্যরা সাতক্ষীরা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দাঁড়াল। ষোড়শ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার প্রথমে ছিল নাটোরে। সরিয়ে সেটাকে নিয়ে আসা হল বগুড়ায়। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমগ্র সীমান্তে ষোড়শ পাক ডিভিশনের সৈন্যরা বাঙ্কার করে বসল। ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের ভাগে পড়ল পূর্ব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব। উত্তর সীমান্তের জামালপুর থেকে দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪ এবং ৩৯ নং ডিভিশনের সৈন্যরা ছড়িয়ে।

বাংলাদেশে পাকবাহিনীর হাতে ছিল ৮৪টা মার্কিন স্যাফি ট্যাঙ্ক। আর ছিল শ'আড়াই মাঝারি বা ভারী কামান। নিয়াজি প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাটিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এর প্রায় সব কিছু নিয়ে জড় করে পাঁচটা কেন্দ্রে-চৌগাছা, হিলি, জামালপুর, সিলেট এবং আখাউড়ায়। ওদিকে তখন খোদ পাক সৈন্যবাহিনী গেরিলাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। গোটা সীমান্ত বরাবর এলাকায় রাত্রে পাক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে চলাফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নিয়াজি বুঝল একটা বড় কিছু না করতে পারলেই নয়। তখন সীমান্তেও তার সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নিয়াজির বুকে তাই তখন বেশ বল। হাজার হাজার লোককে জোরকরে বেগার খাটিয়ে গোটা সীমান্ত জুড়ে বাঙ্কারও তৈরী হয়ে গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর লোকজনরা সেই সব বাঙ্কারে পজিশনও নিয়ে নিয়েছে।

নিয়াজি তাই নতুন হুকুম দিলঃ প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এস।
নভেম্বরেই শুরু হয়ে গেল পাক সেনাবাহিনীর ভারতীয় সীমা অতিক্রম। সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। চব্বিশ পরগণায়, নদীয়ায়, দিনাজপুরে, কোচবিহারে, আসামের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ত্রিপুরার নানা অঞ্চলে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বি, এস, এফ'ও সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। শুরু হয়ে গেল সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলাগুলি বিনিময় এবং প্রায় প্রতিদিনই এই বিপদ বেড়ে চলল। নভেম্বরের গোড়ায় পাকিস্তানীরা ত্রিপুরায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। তারা গোলাগুলি চালাল প্রধানত আখাউড়া অঞ্চল থেকে। এই গোলাবর্ষণে কমলপুর শহর এবং আশপাশের কতকগুলি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীও নিয়মিত এর জবাব দিল। ওদিকে তখন মুক্তিবাহিনীও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন ও সড়ক পথ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আখাউড়ায় কাছে পাকিস্তানীরা একটা বড় ঘাঁটি করেছিল এর কারণও ছিল। বাংলাদেশের ট্রেন-সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আখাউড়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম ঢাকা-সিলেট ময়মনসিংহ রেলপথে আখাউড়া প্রধান জংশন। রেলপথ চট্টগ্রাম থেকে এসে আখাউড়ায় দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর পূর্বে চলে গিয়েছে সিলেটের দিকে। আর একটা মেঘনা নদী ডিঙিয়ে উত্তরে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। দক্ষিণে লাইনটা গিয়েছে ঢাকায়। আখাউড়া তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ভারতের একেবারে লাগোয়া। পাক সমরনায়কেরা জানত, সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনী আখাউড়া দখল করে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাদবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও জানত, লড়াই হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়া দখলের চেষ্টা করবে। তাই তারা আখাউড়ায় বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছিল। কিছুটা দক্ষিণে ফেনীর কাছাকাছি তারা আর একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এবং উদ্দেশ্য, চট্টগ্রাম-ঢাকা-সিলেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় বাধাদান।
এই ফেনীর ঘাঁটি থেকেও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালানো শুরু করল। পাঁচ-ছয়দিন এইভাবে চলার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দেখল এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে না এলে এই গোলাবর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। কারণ, পাকিস্তানীরা কনক্রিটের বাঙ্কার তৈরী করে তার ভেতরে বসে গোলা চালাচ্ছে। দূর থেকে গোলা ছুঁড়ে কনক্রিটের বাঙ্কারকে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। তাই পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটি ধ্বংস করার অনুমতি চাইল দিল্লীতে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লীও সেই অনুমতি দিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অ্যাকশন। ৮ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাক ঘাঁটিগুলিতে জোর আঘাত হানল। পাকিস্তানীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি ছেড়ে তাদের পালাতে হল। এই অ্যাকশনের দুটো প্রত্যক্ষ ফল হল। প্রথমত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার উপর কামানের গোলা বর্ষণের ততটা ক্ষমতা আর পাকিস্তানীদের থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনী আরও জোরে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেল। কারণ, পাকবাহিনী তখন শক্ত ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। গোলাগুলি বিনিময় যেমন বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চলছিল তেমনি চলছি পশ্চিম প্রান্তেও।

পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে বেশি চলছিল তিনটি এলাকায়–বালুরঘাটে, গেদেতে এবং বয়রায়। অক্টোবরের শেষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই পাকবাহিনী এই অঞ্চলে হানা দিচ্ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় গ্রামের লোক গোলা বর্ষণের ফলে মারা যাচ্ছিলেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীরা এই তিনটি ঘাঁটির উপর বড় বড় কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীরা তার জবাবও দিচ্ছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল। পাকিস্তানীরা বাঙ্কারের মধ্যে বসে দূরপাল্লার কামান চালাচ্ছে। কখনও কখনও সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে এসে ভারতীয় গ্রামগুলির উপরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে এখানেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হল।

বয়রা অঞ্চলে সীমান্ত হল কপোতাক্ষ নদ। বয়রা থেকে একেবারে সোজা মাইল বারো-তেরোর মধ্যেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনী কপোতাক্ষের পশ্চিম পাড়ে জড় হতেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক সেনাবাহিনীও এগিয়ে এসেছিল। কনক্রিটের অসংখ্য বাঙ্কারও তৈরী করেছিল এবং সেইসব বাঙ্কার থেকেই গোলা চালাচ্ছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী তখন দিল্লীর নতুন নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশের মর্মকথা, প্রয়োজন হলে সর্বত্র এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। যেন ওইসব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওরা না মানুষ না মারতে পারে। ভারতীয় বাহিনী তাই কপোতাক্ষ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল।

২১ নভেম্বর। ওদিক থেকে এগিয়ে এল পাকবাহিনীও। সঙ্গে নিয়ে এল ১৪টা চীনা স্যাফি ট্যাঙ্ক। ভারী ভারী কামান এবং প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য।

শুরু হল তুমুল লড়াই। ভারতীয় বাহিনীও বাধ্য হয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিল। ট্যাঙ্কে, কামানে, মেসিনগানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়ার পর দেখা গেল প্রথম রাত্রির লড়াইয়ের শেষে পাকিস্তানের ছটা স্যাফি ট্যাঙ্কই ঘায়েল। গোটা আটেক পিছু হটে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী কিন্তু সেখানেই পাকবাহিনীকে ছাড়ল না। আরও এগিয়ে গেল। জগন্নাথপুর এবং গরীবপুর ছাড়িয়ে। পাক সেনাবাহিনী ওখানেও বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় দিন আরও বড় লড়াই হল। এবং সেখানে আরও সাতটা পাকিস্তানী স্যাফি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল। দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ের পাকিস্তান তার বিমান বাহিনীকে পুরোপুরি ভাবে আসরে নামাল। প্রথম দিনের লড়াইয়েই পাক বিমানবাহিনী যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন পাক বিমানবাহিনীর বিমান আকাশে ওড়া মাত্র ভারতীয় বিমানও আকাশে উড়ল। শুরু হল বিমানযুদ্ধ। তিনখানা পাক স্যাবর জেট ধ্বংস হল সেই লড়াইয়ে।

তেরটা ট্যাঙ্ক, তিনখানা বিমান এবং বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত হারিয়ে পাক সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর এগোলো না। কারণ, তখনও দিল্লী থেকে তেমন নির্দেশ আসেনি। তবে, জগন্নাথপুর আর গরীবপুর ছেড়েও তারা চলে এল না। ওইখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল। এখানেও একই ফল হল। ভারতীয় গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। মুক্তিবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল। এই পর্যায়ে তৃতীয় বড় লড়াই হয় বালুরঘাটে। পূর্বে যেমন আখাউড়া, পশ্চিমে তেমনি হিলি। বালুরঘাট অঞ্চলটা একটা কুঁজের মত এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। এই কুঁজেরই শীর্ষ বিন্দু হল হিলি। হিলি শহরটা পশ্চিম বাংলার ভেতরে, কিন্তু হিলি রেল

স্টেশন বাংলাদেশের মধ্যে। এই হিলি স্টেশন হয়েই চলে গিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রেলপথ—যে রেলপথ বাংলাদেশের উত্তর খণ্ডের বাদবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করছে।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বুঝল মুক্তিসেনারা এই রেলপথটা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই শুরু থেকেই তারা হিলি স্টেশনে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করল। মুক্তিসেনারা কিন্তু তৎসত্বেও শুরু থেকেই হিলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। অক্টোবরের শেষাশেষি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীও বালুরঘাট অঞ্চলে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করল। পাকিস্তানীরাও ততদিনে হিলি ঘাঁটি আরও শক্ত করেছে। খুব বড় বড় এবং মজবুত অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করেছে হিলির চতুর্দিকে। এমনকি রেল ওয়াগন দিয়েও ওরা কয়েকটা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করেছিল।
সমগ্র সীমান্তে যখন প্রবল উত্তেজনা এবং গোলাগুলি চলছে সেই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বালুরঘাটের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা শুধু গোলাবর্ষণে সীমাবদ্ধ রইল। তারপর তারা এগোবার চেষ্টা করল তাদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য, দক্ষিণ দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে ঐ কুঁজটা কেটে দেওয়া এবং ওইভাবে বালুরঘাটের ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিটাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তারা বাংলাদেশের ধামরাহাট এবং সাপাথের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান নিয়ে ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করল। ওদিকে ভারতীয় বাহিনীও তখন চুপচাপ বসে নেই। কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখেই তারা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়েছিল এবং সেইমত প্রস্তুতও হচ্ছিল। নভেম্বরের শেষাশেষি এই অঞ্চলে পুরোদমের লড়াই-ই শুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধু ঘাঁটিতে বসেই পাকিস্তানী গোলার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, ভারতীয় বাহিনীও তখন ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে গেল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর গোটা অঞ্চল জুড়ে বড় দরের ট্যাঙ্কের লড়াই হয়ে গেল। এবং শেষদিনের লড়াইয়ে পাক সেনারা এত মার খেল যে ধামরাহাটের দিক থেকে পালাতে বাধ্য হল। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মোট পাঁচটা ট্যাঙ্ক হারালো। কিন্তু ট্যাঙ্ক হারিয়ে বা লড়াইয়ে বড় মার খেয়েও পাকবাহিনী হিলি স্টেশনের ঘাঁটি ছাড়তে চাইল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী, অবশ্য হিলি স্টেশন দখল করার জন্য তেমনভাবে অগ্রসরও হল না।
এইভাবে গোটা সীমান্তে অঘোষিত লড়াই চলতেই শুরু হয়ে গেল পুরোপুরি যুদ্ধ—ঘোষিত হল পাক-ভারত লড়াই এবং লড়াই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের চতুর্দিক দিয়ে এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নিয়াজি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখল এবং এই সর্ষে ফুল দেখার ফলেই বাংলাদেশের পাক সেনানায়ক ইসলামাবাদ থেকে পূর্ণ যুদ্ধের আগাম খবর পেয়েও তার রণকৌশল পাল্টালো না। তখনও তার সেনাবাহিনী এবং কামান-বন্দুক গোটা দেশের সীমান্তেই ছড়ানো রইল এবং তখনও নিয়াজি সীমান্তেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যগ্র। এর মধ্যেও কিছুটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিল নবম ডিভিশনের প্রধান জেনারেল আনসারি, তার সদর ঘাটি ছিল যশোর ক্যান্টনমেন্টে। ৩ ডিসেম্বরই যশোর থেকে নবম পাক ডিভিশনের ঘাঁটি সরিয়ে দিয়ে যাওয়া হল আরও বেশ কিছুটা ভেতরে—মাগুরায়। শোনা যায় সেটাও প্রধানত

কামানের গোলা খাওয়ার ভয়ে। গরীবপুরের লড়াইয়ের পর খোদ যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় কামানের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। নবম পাক ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার যশোর থেকে সরলো; কিন্তু সৈন্যসামন্ত যেমন সীমান্তে ছিল তেমনি রইল। তখনও পাক সেনানায়কদের সংকল্প, বাঙ্কারে বসে বসে গোলা চালিয়েই পাকসৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবে। যেকোনও মুহূর্তে পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, এ খবর নভেম্বরের শেষদিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পেয়েছিল তাই যেকোন মুহূর্তে লড়াইয়ের নামার জন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রস্তুত ছিল। ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিমানবাহিনী যখন অতর্কিতে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তার জবাব পেতেও মোটেই দেরি হল না। পূর্ব-পশ্চিম দুই সীমান্তেই জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে।

৩ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ তারিখ রাত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল। নবম ডিভিশন এগোলো গরীবপুর, জগন্নাথপুর দিয়ে যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দিকে। চতুর্থ ডিভিশন মেহেরপুরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালীগঞ্জ-ঝিনাইদহের দিকে। বিশেতিতম ডিভিশন তার দায়িত্ব দু'ভাবে বিভক্ত করে নিল-একটা অংশ রইল হিলির পাক ঘাঁটির মোকাবিলা করার জন্য। আর একটা অংশ হিলিকে উত্তরে রেখে এগিয়ে চলল। ষষ্ঠ ডিভিশনও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল-একটা তেতুলিয়া থেকে ঠাকুরগাঁর দিকে, আর একটা পাটগ্রাম থেকে কালীগঞ্জের মুখে এবং তৃতীয়টা কোচবিহার থেকে নাগেশ্বরী-কুড়িগ্রামের দিকে। উত্তরে মেঘালয়ের দিকে যে দুটো ব্রিগেড তৈরী হয়েছিল তারাও ওই রাত্রিতেই এগিয়ে গেল। একটা ঢালু থেকে নেমে এগিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর একটা, একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হালুয়াঘাটের মুখোমুখি। পূর্ব দিক থেকেও একই সঙ্গে ৮, ৫৭ এবং ২৩ নং ডিভিশন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকল। একটা বাহিনী এল সুনামগঞ্জ থেকে সিলেটের দিকে। ছোট ছোট তিনটা বাহিনী এগিয়ে চলল হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের পথে। আখাউড়াকে সোজাসুজি আঘাত করে একটা গোটা ব্রিগেডই এগিয়ে চলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।

ওদিকে কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানীদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল। কুমিল্লা সেক্টরের দায়িত্ব ছিল ২৩ নং ডিভিশনের উপর। যুদ্ধ শুরু হতেই ২৩ নং ডিভিশন কুমিল্লা শহরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দাউদকান্দির দিকে। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেল মাত্র কয়েক কোম্পানী সৈন্য। এই ২৩ নং ডিভিশনেরই আর একটা ব্রিগেড চৌদ্দগ্রাম থেকে অগ্রসর হল লাকসামের দিকে। লক্ষ্য চাঁদপুর। পাকবাহিনীও এই আক্রমণ আঁচ করে লাকসামে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। এখানেও ভারতীয় বাহিনী সেই একই কৌশল নিল। লাকসামের পাক ঘাঁটিকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে মূল কলামটা এগিয়ে চলল চাঁদপুরের দিকে। পূর্বে আর একটা বড় বাহিনী এগোলো বিলোনিয়া দিয়ে ফেনীর দিকে। লক্ষ্য চট্টগ্রামে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই বাহিনীরও সেই একই কৌশল। ফেনীতে পাকিস্তানীরা বেশ শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। শুরুতেই সেই ঘাঁটি দখল করার জন্য ভারতীয় বাহিনী কোনও চেষ্টা করল না। একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে যাওয়া হল ফেনীর পাক সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার জন্য। আর মূল বাহিনীটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ

পশ্চিমে। পশ্চিম প্রান্তে বিমান হামলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও নেমে পড়ল। বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর অ্যাকসন শুরু হল মধ্যরাত্রি থেকে। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাল। প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা আর চট্টগ্রাম। ঢাকা ছিল পাক বিমানবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাটিতেই ছিল তাদের জঙ্গী বিমানগুলি। প্রথমে বাংলাদেশে পাক বিমানবাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন বা ২৮ টা জঙ্গী বিমান–এক স্কোয়াড্রন চীনা মিগ–১৯, আর এক স্কোয়াড্রন মার্কিনী স্যাবর জেট। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশে মিগ–১৯ বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলাদেশে থাকল শুধু স্যাবরগুলি। তারও কয়েকটা ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল গরিবপুর লড়াইয়ে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হল পাকস্তানী জঙ্গী বিমানগুলিকে শেষ করে দেওয়া–যাতে অন্তরীক্ষে শত্রুপক্ষ কিছুই না করতে পারে, যাতে লড়াইয়ের শুরুতেই আকাশটা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

৩ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারতীয় বিমানবাহিনী একেবারে তেজগাঁও বিমান বন্দর আক্রমণ করল। ঐ বিমান বন্দরেই পাকিস্তানের সব স্যাবর জেট মজুত ছিল। কারণ গোটা বাংলাদেশের তখন ওই একটি মাত্র বিমান বন্দর যেখান থেকে জেট বিমান উড়তে পারে। ভারতীয় মিগ সেই ঘাঁটিতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী স্যাবর জেটগুলিও বাধা দিতে এগিয়ে এল। প্রায় সারারাত ধরে চলল ঢাকার বিমানযুদ্ধ। প্রথম রাত্রির আক্রমণেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। বিমান বন্দর এবং কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন যে শুধু ঢাকা আক্রমণ করেছিল তাই নয়। আক্রমণ করেছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি এলাকায়ও। চট্টগ্রাম, চালনা, কক্সবাজার এবং চাঁদপুরের অভিযান চালিয়েছিল প্রধানত নৌবাহিনীর বিমানগুলি। চট্টগ্রাম নৌবন্দরের প্রায় অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল। বন্দরের তেলের ডিপোগুলিও জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। এর মধ্যে পাক বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি একবার কলকাতা শহরের হানা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরে যেতে হল। ভারতের বিমানবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন প্রায় সারা রাত ধরে কলকাতা শহরকে পাহারা দিয়েছিল।

৪ ডিসেম্বর সকালে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধানরা আলোচনায় বসে দেখলেন ভারতীয় বাহিনী পূর্বখণ্ডে ঠিক ঠিকই এগিয়েছে। প্রথমত, তারা কোথাও শহর দখলের জন্য অগ্রসর হয়নি। দ্বিতীয়, কোথাও শক্ত পাক ঘাঁটির সঙ্গে বড় লড়াইয়ে আটকে পড়েনি। তৃতীয়ত, পাকিস্তানী সমরনায়করা তখনও বুঝতে পারেনি ভারতীয় বাহিনী ঠিক কোন দিক দিয়ে ঢাকা পৌঁছতে চাইছে। বরং তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সব দিক দিয়েই রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তখনও ভাবছে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের মূল পাক ঘাঁটগুলির উপরই আক্রমণ চালাবে। চতুর্থত, ব্যাপক বিমান এবং স্থল আক্রমণে শত্রুপক্ষকে একেবারে বিহ্বল করে দেওয়া গিয়েছে। পঞ্চমত, পাক বিমানবাহিনীকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা হয়েছে। তাদের বিমান ঘাঁটিগুলিও বিধ্বস্ত। ষষ্ঠত, পাকিস্তানের প্রধান নৌবন্দরগুলি অর্থাৎ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চালনা, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বা স্টীমার ভেড়াবার ব্যবস্থাও অনেকটা বিপর্যস্ত। সপ্তমত,

বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং বাড়িঘরও মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও পূর্ব লক্ষ্য মতই এগিয়ে চলল। পশ্চিম দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের সব ক'টা কলাম পূর্বে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথাও তারা সোজাসুজি পাক ঘাঁটিগুলির দিকে এগোলো না। মূল বাহিনী সর্বদাই ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল এবং ঘাঁটিতে অপেক্ষমান পাকবাহিনী যাতে মনে করে যে ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেইজন্য প্রত্যেক পাক ঘাঁটির সামনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু কিছু লোক রেখে যাওয়া হল।
ওদিকে মূল ভারতীয় বাহিনী যে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানীরা সে খবরও পেল না। কারণ, প্রথমত, তাদের সমর্থনে দেশের লোক ছিল না, যারা খবরাখবর দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাদের বিমানবাহিনীও তখন বিধ্বস্ত। সর্বত্র উড়ে পাকবিমান ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবরাখবর পাক সেনাবাহিনীকে জানাতে পারল না। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বেতারে খবরাখবর পাঠাবার ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। সুতরাং নিজস্ব ব্যবস্থায়ও তারা খবরাখবর পেল না। তাই ভারতীয় বাহিনী যখন সোজাসুজি যশোর, হিলি, সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী প্রভৃতি শক্ত পাক ঘাঁটির দিকে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তখন পাক বাহিনীর অধিনায়করা তা মোটেই বুঝতে পারল না। বরং ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের বহর দেখে তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সোজাসুজিই এগোবার চেষ্টা করছে। সেইজন্য তখনও তারা মূল সড়কগুলি আগ-লে বসে রইল। সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলিতে তখনও পাকবাহিনী অধিষ্ঠিত–একমাত্র কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা ছাড়া। দর্শনা যে মুহূর্তে ৪ নং পার্বত্য ডিভিশনের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পাকিস্তানীরা অমনি শহর ছেড়ে আরও পশ্চিমে পালাল।
এদিকে তখন ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি বার বার ঢাকা, চট্টগ্রাম, চালনা প্রভৃতি এলাকায় সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাল। ঢাকায় সেদিনও জোর বিমান যুদ্ধ হল। কিন্তু সেইদিনই প্রায় শেষ বিমান যুদ্ধ। অধিকাংশ পাক বিমানই ঘায়েল হল। বিমান বন্দরগুলিও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে–প্রধান সড়ক এবং পাক ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে। তখনও পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য, বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়ানো পাকবাহিনীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং আবার যাতে একত্র হয়ে ঢাকা রক্ষার জন্য কোন বড় লড়াইয়ে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।
৫ ডিসেম্বর লড়াইয়ের তৃতীয় দিনেই বাংলার আকাশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশে পাক বিমানবাহিনীর প্রায় সব বিমান এবং বিমান বন্দরই তখন বিধ্বস্ত। গোটা দিন ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি অবাধে আকাশে উড়ে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর হিসাব মত বারো ঘণ্টায় দু'শ ত্রিশবার। তেজগাঁও এবং কুরমিটোলা বিমান ঘাঁটিতে পঞ্চাশ টনের মত বোমা ফেলল। কুর্মিটোলা রানওয়েতে গোটা কয়েক হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলায় ছোটখাটো কয়েকটা পুকুরই সৃষ্টি হয়ে গেল। পাক বিমানবাহিনীর শেষ স্যাবর জেট তিনটা ঐখানে আটকে ছিল। রানওয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় ছাউনিতেই সেগুলিকে আটকে থাকতে হল। ভারতীয় বিমানের আক্রমণে সেদিন বড় রাস্তা দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পাকবাহিনীর

প্রত্যেকটা কনভয়ের উপর ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি আক্রমণ চালাল। ওদের সবুইটা গাড়ি ধ্বংস হল। ধ্বংস হল পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই বেশ কয়েকটা লঞ্চ এবং স্টীমারও। জামালপুর আর ঝিনাইদহের পাক সামরিক ঘাঁটিও ভারতীয় বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল। তেজগাঁও এবং কুর্মিটোলার বিমানবন্দর ধ্বংস করে ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি সারাদিন ধরে গোটা বাংলাদেশের সবক'টা বিমানবন্দরে হানা দিল। উদ্দেশ্য, আর কোথাও পাক বিমান আছে কিনা খুঁজে দেখা। কিন্তু কোথাও আর একটিও পাক বিমান খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে মিত্রপক্ষেরই কাজে লাগবে এই ভেবে ভারতীয় বিমানবাহিনী অধিকাংশ বিমান বন্দরকেই অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিল। পূর্ব খণ্ডে ভারতীয় নৌবাহিনীও বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্গোপসাগরে পাক সাবমেরিন 'গাজী' ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে শেষ হল। সাবমেরিন 'গাজী' ছিল পাক নৌবহরের গর্বের বস্তু। ওই দিন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রত্যেকটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজকে হুঁশিয়ার করে দিল। প্রধান হুঁশিয়ারীটা চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে। বলা হলঃ "আপনারা সবাই চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে আসুন। আপনাদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্টগ্রামের উপর তেমন প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাল সোমবার আমরা প্রচণ্ডভাবে চট্টগ্রামে আক্রমণ চালাব। সুতরাং কাল থেকে আপনাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না। এই 'ওয়ার্নিং'–এ দু'টো কাজ হল। (এক) বিশ্বের সব দেশ বুঝল বাংলাদেশের বন্দরগুলি রক্ষা করার কোনও ক্ষমতা আর পাকবাহিনীর নেই এবং (দুই) ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিমানগুলি বাংলাদেশের সব বন্দরকে ঘায়েল করার অবাধ সুযোগ পেল।

এদিকে তখন স্থলে মিত্রবাহিনীও এগিয়ে চলেছে। পাক স্থলবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। প্রধান সড়কগুলি দিয়ে না এগিয়েও ভারতীয় বাহিনী বিভিন্ন সেক্টরে প্রধান প্রধান সড়কের কতকগুলি এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে, ঢাকার সঙ্গে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের, নাটোরের সঙ্গে ঢাকা ও রংপুরের এবং যশোরের সঙ্গে নাটোর ও রাজশাহীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু ঢাকার সঙ্গে যশোর এবং খুলনার যোগাযোগ তখনও অব্যাহত। কতকগুলি ঘাঁটিতে সেদিন কিছুটা লড়াইও হল। একটা বড় লড়াই হল লাকসামে। আর একটা হল ঝিনাইদহের কাছে কোটচাঁদপুরে। দু'টো লড়াইয়ে পাকসৈন্যরা মার খেল এবং ঘাঁটি দু'টো ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। এই দু'টো ঘাঁটি দখলের চেয়েও কিন্তু মিত্রবাহিনীর বড় লাভ হল পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারায়। এটাই ছিল প্রথম পর্যায়ে তাদের বড় লক্ষ্য, যাতে পাক সেনাবাহিনী পিছু হটে গিয়ে আবার না রিগ্রুপড হতে পারে– ঢাকা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝখানে কোনও নতুন শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে। বিভিন্ন বড় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে মিত্রবাহিনী সীমান্তের ঘাঁটিগুলি থেকে পাকবাহিনীর ঢাকার দিকে ফেরার পথ প্রায় বন্ধ করে দিল। এব্যাপারে তাদের আরও সুবিধা হল আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। গোটা বাংলাদেশের সব বড় সড়ক ও নদীর উপর তখন ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাহারা দিচ্ছে এবং পাক সেনাবাহিনীর কনভয় চোখে পড়লেই তাকে আক্রমণ করছে।

'বাংলা নামে দেশ' গ্রন্থে আরো বলা হয়েছেঃ চতুর্দিকে থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পৌঁছল ঢাকায়। আর পৌঁছল পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদ। নিয়াজি আরও জানতে পারল যে মিত্রবাহিনীর সবকটা কলাম মূল পাক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত পথগুলি এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। পাক সমরনায়কদের তখন বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মিত্রবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন পাক ঘাঁটির যোগাযোগ কেটে দেওয়া এবং পেছন থেকে পাক ঘাঁটিগুলির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করা। নিয়াজি এবং ঢাকায় পাক সমরনায়করা ততক্ষণে আরও বুঝে গিয়েছে যে, মিত্রবাহিনী শুধু বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ দখল করতে চায় না-তারা চায় গোটা বাংলাদেশে পাক বাহিনীকে পরাজিত করতে। তারা বুঝল মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে এগোবেই। কিন্তু তখনও তারা এটা ঠিক বুঝতে পারেনি যে, মিত্রবাহিনীর কোন কোন কলাম ঢাকার দিকে এগিয়ে আসবে। নিয়াজি তাই অন্যান্য পাক সমরনায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইদিনই সর্বত্র হুকুম পাঠিয়ে দিল। পুল ব্যাক করে তাদের ঢাকার কাছাকাছি অর্থাৎ পদ্মা-মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে ফিরে আসতে বলা হল। ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যে বেলায়ই সেই হুকুম সবগুলি পাক সামরিক ঘাঁটিতে চলে গেল। ৬ ডিসেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কতকগুলি সীমান্ত ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর পিছু হটা শুরু হল। কোনও কোনও ঘাঁটির পাক অধিনায়করা আবার অ্যাডভান্স পার্টি পাঠিয়ে পেছনের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করল এবং অনেকেই দেখল পেছনের অবস্থাও ভাল নয়। একে তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তার উপর আবার বহু এলাকায় পেছনে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে বসে গিয়েছে। নিয়াজির "পুল ব্যাক" নির্দেশের পর তাই গোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনীতে একটা সত্যিকারের অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হল। অধিকাংশ পাক সীমান্ত ঘাঁটির সামনেই তখন এক সমস্যা-সীমান্ত ঘাঁটিতে বসে থাকার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য, আবার পিছাতে গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কয়েকটা সীমান্ত ঘাঁটি থেকে তাই নিয়াজিকে জানান হল, পুল ব্যাক করার চেয়ে শক্ত বাঙ্কারে ঘেরা ঘাঁটিতে বসে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।
কুর্মিটোলার নির্দেশ তাই সর্বত্র সমানভাবে পালিত হল না। কোথাও পূর্ণ পুল ব্যাক হল। কোথাও হল আধা-পুল ব্যাক। কোথাও আবার যেমন ছিল তেমনই রইল। যেসব ঘাঁটিতে ওরা থেকে গেল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ময়নামতি, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং হিলি। যেসব ঘাঁটি থেকে তারা পালাল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় যশোরের ও সিলেটের। সিলেট এবং যশোরের চতুর্দিকে পাকবাহিনী যতগুলি ঘাঁটি করেছিল সবগুলিই ছেড়ে পালাল। পাক নবম ডিভিশনের উপর পদ্মার দক্ষিণের গোটা অঞ্চলটা রক্ষার দায়িত্ব ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই পাক নবম ডিভিশনের সদর দফতর যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে মাগুরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নবম ডিভিশনের

সৈন্যসামন্ত ঠিকই সীমান্তে ছিল। চৌগাছায় পরাজয়ের পর তারা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিল। ঝিনাইদহ-মেহেরপুর অঞ্চলে একটা অংশ, ঝিকরগাছার উত্তর পশ্চিমে আর একটা অংশ এবং সাতক্ষিরা থেকে খুলনা পর্যন্ত আর একটা অংশ। ৫ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিশন আঘাত হানল ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিমের পাকবাহিনীর উপর। প্রায় একসঙ্গে ভারতীয় নবম ডিভিশন ঘা দিল ঝিকরগাছা থেকে ঝিনাইদহের পশ্চিমে ছড়ানো অংশটার উপর। এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই পাকবাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং দু'দিক থেকে মিত্রবাহিনীর দুটো কলাম যশোর ঢাকা হাইওয়ের ওপর এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে নিয়াজির পুল ব্যাক অরডারও এসে গিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ভোর থেকেই তাই গোটা পাক নবম ডিভিশনের পলায়ন পর্ব শুরু হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল গোটা বাহিনীটাই ঢাকার দিকে পালাবে। কিন্তু তা পারল না। কারণ ততক্ষণে ভারতীয় চতুর্থ এবং নবম ডিভিশন যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দুটো অঞ্চলে ঘাঁটি করে বসেছে। বাধ্য হয়ে তাই পাক নবম ডিভিশনের একটা অংশ পালাল মাগুরা হয়ে মধুমতী নদী ডিঙিয়ে ঢাকার পথে। আর একটা অংশ পালাল খুলনার দিকে। কুষ্টিয়ার দিক দিয়েও পালাল একটা ছোট অংশ। সাতক্ষিরা অঞ্চলে যে পাকবাহিনীটা ছিল এতদিন তাদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা এবং বি-এস-এফের সেপাইরা। পুল ব্যাক অরডারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও পালাল খুলনার দিকে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবক'টা বাহিনীই রাস্তার ওপরের সব ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। সিলেটেও তখন প্রায় একই অবস্থা। দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিত্রবাহিনী সিলেটের পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিক থেকে একটা গোলন্দাজ বাহিনীও সিলেটের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। সিলেটের পাক সমরনায়ক পুল ব্যাক অরডার পাওয়া মাত্র পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে যাবে। কিন্তু পারল না। কিছুটা পিছিয়েই দেখল, সম্ভব নয়-মিত্রবাহিনী তার আগেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকল সিলেটে আর একটা পেছনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দু'দলই লড়াই চালাল এবং দু দলই লড়াইয়ে হেরে গেল। সিলেটের বাহিনীকে ঘায়েল করতে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে বেশ কয়েক টন বোমাবর্ষণ করতে হল। সমগ্র বাংলাদেশেই মিত্রবাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তখনও একই লক্ষ্য- যাতে পিছু হটে গিয়ে পাকবাহিনী কোথাও না জড় হতে পারে, যাতে সীমান্তের কোনও পাকসৈন্য না ঢাকায় পৌঁছতে পারে।

৭ ডিসেম্বরঃ কার্যত যশোরের পতন হয়েছিল আগের দিনই। ৬ তারিখ সন্ধ্যা হতে না হতেই পাকবাহিনীর সবাই যশোর ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী তখনই সে খবরটা পায়নি। ৭ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিভিশনের প্রথম কলামটা উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে এসে পৌঁছল। তখনও তারা জানে না যশোর ক্যান্টনমেন্ট শূন্য। তখনও তাদের কাছে খবর, পাকবাহিনী যশোর রক্ষার জন্য বিরাট লড়াই লড়বে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর কলামটা যতই এগিয়ে এল ততই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনও প্রতিরোধ নেই। সামনে থেকে একটাও গোলাগুলি আসছে না। যখন কলামটা একেবারে ক্যান্টনমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জনতা "জয়বাংলা" ধ্বনি দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। আর জানাল যে, আগের দিনই সব পাকসেনা যশোর ছেড়ে

পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝল। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক এসে সেখানে জড় হল। তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরটা চিনিয়ে দিল ভারতীয় বাহিনীকে। পাক সেনারা যে ট্যাঙ্ক, কামান এবং ট্রাক-জিপ নিয়ে খুলনা পালিয়েছে যশোরের নাগরিকরা তাও ভারতীয় বাহিনীকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী ছুটল খুলনার পথে। ওদিকে তখন নবম ডিভিশনের সদর ঘাঁটিতেও সব খবর পৌঁছে গিয়েছে। ডিভিশনের প্রধান মেঃ জেনারেল দলবীর সিং বয়রা-ঝিকরগাছার পথ ধরে গোটা নবম ডিভিশনকে নিয়ে এগিয়ে এলেন যশোর শহরে। যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাক নবম ডিভিশনের মত আমাদের নবম ডিভিশনের সদর দফতর হল। সিলেটের পতন হল ওইদিনই দুপুরে। প্রথমে ভারতীয় ছত্রীসেনারা নামল সিলেটের নিকটবর্তী বিমানবন্দর শালুটিকরে। খুব ভোরে। তারপর চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী সিলেটের পাক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাল। দুপুর বেলায়ই সিলেটের পাক সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

৮ ডিসেম্বর সকালে মিত্রপক্ষের সামরিক নেতারা পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য সফল হয়েছে। বাংলাদেশের নানা খণ্ডে পাক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ। ঢাকার দিকে পালাবার কোনও পথ নেই। দক্ষিণে একটা পাকবাহিনী আটকে পড়েছে খুলনার কাছে। উত্তরের গোটা পাকবাহিনীও ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তিন-চারটা অঞ্চলে অবরুদ্ধ। একটা বড় বাহিনী, প্রায় একটা ব্রিগেড, হিলির কাছে অবরুদ্ধ। আর একটা ব্রিগেড আটকে রয়েছে জামালপুরে। ময়মনসিংহ থেকে যে বাহিনীকে সরিয়ে সিলেটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা কার্যত নিষ্ক্রিয়। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ আর একটা ব্রিগেড। আর একটা বড় পাকবাহিনী অবরুদ্ধ চট্টগ্রামে। একের সঙ্গে আর একের যোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ঢাকার দিকে পিছু হটাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মিত্রবাহিনীর কর্তারা তখন তিনটা ব্যবস্থা নিলেন প্রথম ব্যবস্থায়, গোটা পাক সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, জেনারেল সগৎসিংকে বলা হল তাঁর অন্তত তিনটা কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে নিতে। তৃতীয় ব্যবস্থায়, একটা ব্রিগেডকে যথাশীঘ্র সম্ভব হালুয়াঘাটের দিক থেকে ময়মনসিংহের দিকে নিয়ে আসা হল। যুদ্ধের শুরুতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উদ্দেশে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৮ ডিসেম্বর আবার তাঁর সেই আবেদন নানা ভাষায় বার বার আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল। তিনি পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনেভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে। জেনারেল মানেকশ বললেন, আমি জানি আপনারা পালাবার জন্য বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গায় জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি, ওখান থেকে আপনাদের উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশাতেই আপনারা ওসব জায়গায় গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এজন্য নৌবাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি আপনারা আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে জেনারেল

সগৎ সিং-এর প্রায় সব কটা ডিভিশনই তখন প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছিল। একটা এগোচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে আশুগঞ্জের দিকে। আশুগঞ্জে মেঘনার উপর বিরাট পুল রয়েছে। এপারে আশুগঞ্জ, ওপারে ভৈরববাজার। প্রচণ্ড গতিতে সেই পুলের দিকে এগোলো একটা বাহিনী। ওদিকে সেদিন কুমিল্লাও পতন ঘটেছে। ওই সেক্টরের সব পাকসৈন্য গিয়ে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিল। মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা সেদিন হেলিকপ্টারে কুমিল্লা ঘুরে এলেন। ময়নামতিকে পাশ কাটিয়ে আর একটা বাহিনী দ্রুত এগিয়ে গেল দাউদকান্দির দিকে। আর একটা বাহিনী লাকসামের দিক থেকে দ্রুত অগ্রসর হল চাঁদপুরের মুখে। সব কটা বাহিনীরই লক্ষ্য ঢাকা। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যাতে এই বাহিনী নদী পথেই নারায়ণগঞ্জ –ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই বাহিনীর আর একটা লক্ষ্য ছিল চাঁদপুর বন্দর থেকে মেঘনা ও পদ্মার নদীপথের ওপর নজর–রাখা।

বাংলাদেশে লড়াইয়ে নামতে হতে পারে এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকার ওপর প্রধান আক্রমণটা করা হবে উত্তর দিক দিয়ে। ময়মনসিংহ–টাঙ্গাইলের পথে একটা বড় বাহিনীকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকায়। ওপথে নদীনালা খুব কম। সেই উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই তাঁরা গারো পাহাড়ে দু ব্রিগেড সৈন্য মজুত করেছিলেন। বেশী সৈন্য ওই পথে জড় করেননি, কারণ ভয় ছিল যে, তাহলে পাকিস্তানীরা খবরটা আগাম পেয়ে যাবে এবং আগে থেকেই পথে একটা বড় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে রাখবে। সেইজন্যই ওপথে কম সৈন্য জড় করা হল এবং ঠিক করে রাখা হল যে পদাতিক সৈন্য টাঙ্গাইলের কাছাকাছি পৌঁছবার পর ওখানে একটা ছত্রী বাহিনীও নামানো হবে।

পাক সমরনায়করাও ধরে রেখেছিল যে ভারত উত্তর দিক দিয়ে একটা বড় সেনাবাহিনী নামাবার চেষ্টা করবেই। সেইজন্য তারা জামালপুরের কাছে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে রেখেছিল। আর একটা ছোট ঘাঁটি করে রেখেছিল হালুয়াঘাটের কাছে। লড়াই শুরু হতেই ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড এগোলো জামালপুরের দিকে। আর একটা গেল হালুয়াঘাটের কাছে। হালুয়াঘাটের সীমান্তবর্তী ভারতীয় বাহিনী প্রথমে অগ্রসর হল না। দু'চারদিন ওখানেই অপেক্ষা করল। জামালপুরে বড় লড়াই শুরু হতে পাক সামরিক নেতারা তাদের হালুয়াঘাটের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর ময়মনসিংহ থেকে প্রায় একটা ব্রিগেড নিয়ে গেল সিলেট ভৈরববাজার সেক্টরে। তারা তখন ভাবতেও পারেনি যে একটা ভারতীয় ব্রিগেড হালুয়াঘাটের মুখে অপেক্ষা করছে। হালুয়াঘাট থেকে ভারতীয় বাহিনী খুব দ্রুত এগিয়ে এল ময়মনসিংহের দিকে। পথে বড় কোন বাধাই পেল না। কারণ একটা পাকবাহিনী লড়াই করছে জামালপুরে আর একটা গিয়েছে ভৈরববাজার–সিলেট সেক্টরে। একই সঙ্গে বিমান আক্রমণও বাড়ানো হল। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি সারাদিনে অসংখ্যবার বিভিন্ন পাক সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাল। বিমান আক্রমণের ভয়ে দিনের বেলা পাক সামরিক বাহিনীর চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পরিকল্পনা মতই বিমান আক্রমণ বৃদ্ধি করা হল। লক্ষ্যটা একই। প্রথমত, পাক সেনাবাহিনীকে আবার কোথাও বিন্যস্ত হতে না দেওয়া। এবং দ্বিতীয়ত, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া–যাতে রা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৯ ডিসেম্বর চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হল। তখন তাদের একমাত্র

লক্ষ্য শুধু ঢাকা। এর আগেই তাদের প্রথম লক্ষ্যটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের নানা প্রান্তে চড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীকে বেশ ভালোমত বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাদের ঢাকা ফেরার বা পালাবার প্রায় সব পথ বন্ধ। এবার দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল ভারতীয় বাহিনী। দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হল খুব দ্রুত ঢাকায় পৌঁছানো এবং ঢাকার পাকবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নিয়াজিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। সব দিক থেকেই মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হল। পূর্বে পৌঁছে গেল আশুগঞ্জে, দাউদকান্দিতে এবং চাঁদপুরে। পশ্চিমে একটা বাহিনী পৌঁছল মধুমতী নদীর তীরে। আর একটা বাহিনী কুষ্টিয়া মুক্ত করে চলল গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। হালুয়াঘাট থেকে এগিয়ে আসা বাহিনীও পৌঁছে গেল ময়মনসিংহের কাছাকাছি। নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও ততক্ষণে নানা দিক থেকে এগোচ্ছে ঢাকার দিকে এবং বিমানবাহিনীর আক্রমণও পুরাদমেই চলছে। সেদিন বিকালে মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, আমরা এখন ঢাকার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেনঃ পাকিস্তানীরা যদি মাটি কামড়ে ঢাকার লড়াই চালাতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন? জেনারেল অরোরা জবাব দিলেন; ওরা কী করবে জানি না, তবে আমরা লড়াইয়ের জন্যই প্রস্তুত। জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন; ঢাকাকে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী? অরোরা বল- লেনঃ নদী। তারপর আবার বললেন, নদী যদিও বড় বাধা সে বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদের পদাতিক সৈন্য এবং রসদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পি,টি ৬৭ ট্যাঙ্কগুলি নিজে থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে।
১০ ডিসেম্বর ৫৭ নং ডিভিশন গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল মিত্রবাহিনী কিভাবে রাজধানী ঢাকার মুক্তিযুদ্ধে নদীর বাধা অতিক্রম করবে। ভোররাত্রি থেকে ভৈরববাজারের তিন চার মাইল দক্ষিণে হেলিকপ্টারে করে নামানো শুরু হল ৫৭ নং ডিভিশনের সৈন্য। সারাদিন ধরে মেঘনা অতিক্রমের সেই অভিযান চলল। প্রথম বাহিনী ওপারে নেমেই ঘাঁটি গেড়ে বসল। কিছুটা উত্তরে ভৈরববাজারের কাছেই তখন পাকসৈন্যদের একটা বড় বাহিনী মজুত। ব্রিজটার একটা অংশ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর পশ্চিম পারে ওতপেতে বসে আছে। আকাশে সূর্য উঠতেই তারা দেখতে পেল হেলিকপ্টার নদী পার হচ্ছে। কিন্তু দেখেও তারা ঘাঁটি ছাড়তে সাহস পেল না। ভাবল, ওটা বোধহয় ভারতীয় বাহিনীর একটা ধাপ্পা। ওদিকে ছুটে গেলেই আশুগঞ্জ থেকে মূল ভারতীয় বাহিনী ভৈরববাজারের ওখানে এসে উঠবে। ,তারপর ভৈরববাজার-ঢাকা রাস্তা ধরবে। সত্যিই কিন্তু পাকবাহিনীকে ভুল বোঝাবার জন্য মিত্রবাহিনীর একটা বড় কলাম তখন এমন ভাবসাব দেখাচ্ছিল যে তারা আশুগঞ্জ দিয়েই মেঘনা পার হবে। পাকবাহিনী এইভাবে ভুল বোঝায় মিত্রবাহিনীর সুবিধা হল। একরকম বিনা বাধায় মেঘনা পার হওয়া গেল। হেলিকপ্টারে নদী পার হল কিছু সৈন্য। অনেকে আবার নদী পার হল স্টীমারে এবং লঞ্চে করে। কিছু পার হল স্রেফ দেশী নৌকাতেই। ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে সমস্যাও দূর হল এক অভাবনীয় উপায়ে। রাশিয়ান ট্যাঙ্ক সাঁতরাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একনাগাড়ে আধঘন্টার বেশী সাঁতরালেই ট্যাংক ভীষণ গরম হয়ে যায়। অথচ মেঘনা পার হতে আধঘন্টার অনেক বেশী সময় লাগবে। তখন ঠিক হল, ট্যাঙ্কগুলি যতটা সম্ভব নিজেই সাঁতরে এগোবে। তারপর নৌকাতে দড়ি বেঁধে ট্যাঙ্কগুলিকে টেনে নদীর ওপারে নিয়ে

যাওয়া হবে। স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব সাহায্য ছাড়া এই বিরাট অভিযান কিছুতেই সার্থক হত না। ওখানের মানুষ যেভাবে পারল মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করল। শত শত নৌকা নিয়ে এল তারা। সেইসব নৌকা বার বার মেঘনা পারাপার করল। যেখান থেকে মিত্রবাহিনী নদী পেরিয়েছিল সেখানে কোনও রাস্তাঘাট ছিল না। সেটা ছিল জলাজমি। এই জলা জমি দিয়ে কামান বন্দুক ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার শত শত বাঙালী। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে তারপর তারা পৌঁছেছিল ভৈরববাজার–ঢাকা মূল সড়কে এবং পরদিনই তারা রায়পুর দখল করে নিল।

ওদিকে তখন উত্তরের বাহিনীটাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। ময়মনসিংহের কাছে পৌঁছে তারা দাঁড়াল। খবর ছিল যে ময়মনসিংহে পাকবাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু সে ব্রিগেডটাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনী তা জানত না। তাই মিত্রবাহিনী ময়মনসিংহে বড় লড়াই করার জন্য সেদিনটা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে শম্ভুগঞ্জে অপেক্ষা করল। অন্যদিকে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও সেদিন পাক সেনাবাহিনীকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঢাকা বেতার কেন্দ্রটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে এল। কুর্মিটোলার উপর বার বার রকেট আর বোমা ছুঁড়ল। নৌবাহিনীর বিমান আক্রমণে চট্টগ্রাম এবং চালনার অবস্থাও তখন অত্যন্ত কাহিল। কয়েকটা স্টীমার ভর্তি হয়ে পাকবাহিনী বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালাতে গিয়েছিল। একটা জাহাজে নিরপেক্ষ দেশের পতাকা উড়িয়েও কিছু পাকসৈন্য সিঙ্গাপুরের দিকে পালাচ্ছিল। সব ধরা পড়ল। কয়েকটা পাক বাণিজ্য জাহাজও মাঝ দরিয়ায় ঘায়েল হল। ১১ ডিসেম্বর পাক সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল বহু পাকঘাঁটি পতন হল সেদিন। মুক্ত হল জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি, গাইবান্ধা, ফুলছড়ি বাহাদুরাবাদ, পিরগাছা, দুর্গাদিঘি, বিগ্রাম এবং চণ্ডীপুর। বিভিন্ন এলাকায় শত শত পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করল। এক জামালপুরেই আত্মসমর্পণ করল ৫৮১ জন। চাঁদপুরের উত্তরে মতলববাজারেও বহু পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করল। কিছু আবার পেছনের দিকে পালাতে গিয়ে মার খেল। যেমন জামালপুরের বাহিনীর একটা অংশে। জামালপুরের পাক বাহিনী বেশ কিছুদিন ধরে ভাল লড়াই–ই চালিয়েছিল। মাটি কামড়ে তারা লড়াই চালাচ্ছিল, এই লড়াইয়ে ভারতীয় জেনারেল গিল মারাত্মক আহত হলেন। কিন্তু ১১ তারিখ আর পারল না। একটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। আর একটা টাঙ্গাইলের দিকে পালাল।

উত্তরে ১০১ নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড তখন ময়মনসিংহ দখল করে নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে তারা সোজা ঢাকা এগোতে পারল না। কারণ রাস্তাটাই সোজা যায়নি। গিয়েছে টাঙ্গাইল ঘুরে। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার রেললাইনটা ছিল সোজাসুজি। কিন্তু পালাবার আগে পাকবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের ওপরের রেল সেতুটা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। ভেঙে দিয়েছিল ওই পথের আরও কয়েকটা রেলপুল। তাই ভারতীয় বাহিনীকে টাঙ্গাইলের পথেই এগোতে হল। সেইটাই অবশ্য ছিল তাদের পরিকল্পনা। ওদিকে ভৈরববাজারের দিক থেকেও তখন এগিয়ে আসছে ৫৭ নং ভারতীয় ডিভিশন। কিছুটা এগিয়েই তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা গেল নরসিংদির দিকে। বিমানবাহিনীও তখন পুরোদমে আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তানীরা মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালায় তো বিমানবাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে। বিমানবাহিনী সেদিন একমাত্র ঢাকাকে রেহাই দিল। কারণ ভারত সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, ওইদিন ঢাকা করাচির উপর কোনও

আক্রমণ করা হবে না। বিদেশীদের ঢাকা থেকে বের করে আনার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান তেজগাঁওয়ে নামতে দেওয়া হবে এবং সেজন্য তেজগাঁও বিমান বন্দর সারাতেও দেওয়া হবে। নৌবাহিনী কিন্তু সেদিনও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল।

১২ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার উপর কোনও আক্রমণ করল না। সেদিন বিদেশীদের নিয়ে ঢাকা থেকে তিনখানা আন্তর্জাতিক বিমান এল কলকাতায়। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে মুক্ত মানুষেরা এল কলকাতায়। বিমানবাহিনী সেদিন অন্যত্র ভীষণ ব্যস্ত। ভোররাতেই ছত্রীসেনারা নেমেছে টাঙ্গাইলে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই এই ছত্রীসেনাদের নামানো হল। ময়মনসিংহের দিক থেকে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডটাও তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে টাঙ্গাইলে। শত্রুপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য প্রথমে কিছু খড়ের ভুয়া ছত্রীসেনা নামানো হল নদীর দক্ষিণে। মীরজাপুর আর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি। ভুয়া ছত্রীদের নামানো হয়েছিল প্রথম রাত্রে। কিন্তু পাকসেনা সেই ভুয়া ছত্রীসেনা খুঁজতে ছুটল। তারপর ভোররাতে নদীর উত্তরে নামানো হল আসল ছত্রীসেনা। এক ব্যাটালিয়ন—অর্থাৎ প্রায় এক হাজার। মাটিতে নামতেই তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পেল। বিমান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরাই ছোটাছুটি করে তা সব সংগ্রহ করে দিল ছত্রীসেনাদের। উত্তর দিক দিয়ে তখন জামালপুরের পাকবাহিনীর একটা অংশ পিছু হটে আসছিল। এদের আগমনের খবর জানা ছিল না ভারতীয় বাহিনীর। কারণ, এরা প্রধানত রাতের অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসছিল। আচমকা এই পাকবাহিনীটা এসে পড়ল ছত্রীসেনাদের সামনে। ওরাও আবার জানত না যে ভারতীয় ছত্রীসেনারা ওখানে নেমেছে। ভারতীয় ছত্রীসেনারাই প্রথমে দেখতে পেল পাকবাহিনীকে। দেখতে পেয়েই গুলি চালাল এবং সেই আচমকা আক্রমণে পাকবাহিনী একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ল। প্রথমেই তারা ছিটকে পড়ল। তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে আবার দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ছত্রীসেনারা পুরোপুরি তৈরী। পাকসেনারা কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পরই পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও পারল না। কারণ ততক্ষণে ময়মনসিংহের দিক থেকে ১০০ নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেড ও এসে গিয়েছে পেছনে। বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল।

টাঙ্গাইলের ছত্রীসেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট বিমান বন্দরটা দখল করে নিল। তারপর থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখানে ক্যারিবু বিমানের অবতরণ শুরু হল। এল আর সৈন্য ও বহু অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের নানা সাজসরঞ্জাম। কয়েক ঘণ্টা পর ১০১ নং কমিউনিকেশন ব্রিগেড এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। দুই বাহিনী একত্রে এগিয়ে চলল ঢাকার পথে মীরজাপুরের দিকে। ওদিকে তখন ৫৭ নং ডিভিশনও পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। তারা নরসিংদী অতিক্রম করে বেশ কিছুটা এগিয়েছে। সেদিনই প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কামানের গর্জন শোনা গেল এবং সেই গর্জন শুনে নিয়াজি সহ ঢাকার পাকবাহিনীর অন্তর কেঁপে উঠল।

ওদিকে কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকবও আর এক কাণ্ড করে বসে আছেন। সকালে সাংবাদিক বৈঠক। জেনারেল জ্যাকব সেখানে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন। সাংবাদিকরা, তাঁকে এই ছত্রীসেনা নামাবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করল। জেনারেল জ্যাকব বললেন, হ্যাঁ ছত্রীসেনা নেমেছে। তবে কোথায় নেমেছে, কত নেমেছে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। বিদেশী সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে যত প্রশ্ন করলেন,

জেনারেল জ্যাকব ততই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তারই মধ্যে তিনি ইঙ্গিতে এমন একটা ধারণা দিলেন যে এক ব্রিগেডের বেশি ছাত্রীসেনা নামানো হয়েছে এবং ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকায় তারা নেমেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই খবর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে দিল। খবরটা ঢাকায়ও পৌঁছল। পাক সমরনায়করা সেই খবর পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল হয়ত ঢাকার চতুর্দিকেই মিত্রবাহিনী প্রচুর ছাত্রীসেনা নামিয়েছে এবং এবার আর রক্ষা নেই। জেনারেল মানেকেশর আবেদনও তখন বার বার প্রচারিত হচ্ছে "বাঁচতে চান তো আত্মসমর্পণ করুন। পালাবার কোন পথ নেই। লড়াই করা বৃথা। আত্মসমর্পণ করলে সব পাকসেনা জেনেভা কনভেনশন অনুসারে ব্যবহার পাবেন"।

১৩ ডিসেম্বর মিত্র সেনাবাহিনী যতই ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং ঢাকার উপর বিমান হানা যতই বাড়ছিল ঢাকার পাক সামরিক নেতাদের অবস্থাও ততই কাহিল হয়ে উঠছিল। সাধারণত বিপদে পড়লে জেনারেলেরা যা করে প্রথম প্রথম এরাও তাই করল– ইসলামাবাদের কাছে বার বার আরও সাহায্য পাঠাবার আবেদন জানাল। বলল: ভারত অন্তত ন' ডিভিশন সৈন্য এবং দশ স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে। সুতরাং আমাদেরও অবিলম্বে আরও কয়েক ডিভিশন সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়াড্রন বিমান চাই। ইসলামবাদ প্রথমে ঢাকার কর্তাদের বলেছিলঃ তোমরা মাত্র কয়েকটা দিন লড়াইটা চালিয়ে যাও। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই পশ্চিমখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীকে এমন মার দেব যে তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে এবং তখন যুদ্ধই থেমে যাবে। সুতরাং তোমাদেরও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই ঢাকার পাক কর্তারা বুঝতে পারল, ওদিকেও বেশি সুবিধা হচ্ছে না। ভারতের নতজানু হওয়ারও কোনও–ই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড বেগে ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। তখন তারা অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেল প্রধানত দুটো কারণে। প্রথম কারণ, পালাবার পথ নেই। কোথাও যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে তার উপায় নেই। বিমান বন্দরে পালাবার মত কোনও পাক–বিমান নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে যেদিকেই যাওয়া যাবে, ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনী বা স্থানীয় মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ কতটা ক্ষেপে আছে সেটা তাদের জানতে তখন বাকি নেই। তাই মিত্রবাহিনী পদ্মা এবং মেঘনার কূলে এসে দাঁড়ানো মাত্রই ঢাকার পাক কর্তাদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল। তারা অসহায় বোধ করতে শুরু করেছিল। এর উপর যখন তারা দেখল যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো পাকবাহিনীও আর ঢাকার দিকে ফিরতে পারছে না তখন তারা অনেকে একেবারে হাত–পা ছেড়ে দিল।

ওদিকে তখন পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকার প্রায় পনেরো মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। ৫৭ নং ডিভিশনের দুটো ব্রিগেড এগিয়েছে পূর্ব দিক থেকে, উত্তর দিক থেকে এসেছে গন্ধর্ব নাগরার ব্রিগেড এবং টাঙ্গাইলে নামা ছাত্রীসেনারা। পশ্চিমে ৪ নং ডিভিশনও মধুমতী পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছে পদ্মার তীরে। উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামানের গোলাও পড়া শুরু হয়েছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে এবং বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলিও বার বার হানা দিচ্ছে 'ঢাকার সব ক'টা সামরিক ঘাঁটির উপর। পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বতোভাবে সচেষ্ট।

একদিকে চলছে কামানে–বিমানে তীব্র আক্রমণ, আর একদিকে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের আবেদন। জেনারেল মানেকশ'র বাণী সেদিন প্রচারিত হল রাও ফরমান আলীর উদ্দেশ্যে। জেনারেল মানেকশ বললেন: " আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। সুতরাং আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আত্মসমর্পণ না করলে নিশ্চিত মৃত্যু। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।"

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেদিন শত শত পাকসেনা আত্মসমর্পণ করল। এক ময়নামতিতেই আত্মসমর্পণ করল ১১৩৪ জন। কিন্তু তখনও নিয়াজি অবিচল। তখনও সে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং তখনও তার সঙ্গে একমত হয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে খুলনা, বগুড়া এবং চট্টগ্রামের পাক অধিনায়করা।

১৪ ডিসেম্বরঃ নিয়াজি তখনও গোঁ ধরে বসে আছে, কিন্তু আর প্রায় সকলেরই হৃদকম্প উঠে গিয়েছে। ১৩ তারিখ রাত থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর কামান অবিরাম গোলা মেরে চলল। গোলাগুলি পড়ল গিয়ে প্রধানত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সে গোলার আওয়াজে সারারাত ধরে গোটা ঢাকা কাঁপল। ঢাকার সবাই সেদিন ভীষন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বুঝল, আর রক্ষা নেই। গভর্নর মালিক সেদিন সকালেই "সমগ্র পরিস্থিতি" বিবেচনার জন্য গভর্নর হাউসে মন্ত্রীসভার এক জরুরী বৈঠক ডাকল। এই বৈঠক বসাবার ব্যাপারেও ফরমান আলী এবং চীফ সেকরেটারি মুজাফফর হোসেনের হাত ছিল। তারা তখনও মনে করছে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই, রক্ষা নেই।

মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল বেলা এগারোটা নাগাদ। একটা পাকিস্তানী ওয়ারলেস মেসেজ ধরে মিত্রবাহিনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেল সেই বৈঠকের খবর। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ চলে গেল ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টারে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ঝাঁক ভারতীয় জঙ্গী বিমান উড়ে এল ঢাকা গভরনর হাউসের উপর। একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা ছুড়ল রকেট। গোটা পাঁচেক গিয়ে পড়ল একেবারে গভরনর হাউসের ছাদের উপর। মিটিং তখনও চলছিল। মালিক এবং তার মন্ত্রীরা ভয়ে কেঁদে উঠল। চীফ সেকরেটারি, আই, জি, পুলিশ প্রভৃতি বড় বড় অফিসাররাও মিটিং–এ উপস্থিত ছিল। তারাও ভয়ে যে যেমন পারল পালাল। বিমান হানা শেষ হওয়ার পর মালিক সাহেব তার পাত্র মিত্রদের সঙ্গে আবার বসলেন এবং তারপর আর পাঁচ মিনিটও লাগল না। তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, "আমরা সবাই পদত্যাগ করলাম"। সেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি প্রতিনিধি রেনড সাহেবকে জানাল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাইল। রেনড সাহেব তখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলকে রেডক্রসের অধীনে "নিরপেক্ষ এলাকা" করে নিয়েছেন। এই "নিরপেক্ষ এলাকা" তখন ঢাকায় একটা অদ্ভুত জিনিস। গোটা ঢাকা তখনও পাকিস্তানীদের দখলে, শুধু এই হোটেলটা ছাড়া। হোটেলটার উপরে রেডক্রসের বিরাট পতাকা উড়ছিল। বহু বিদেশী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আশ্রয় নিয়েছিল ওই হোটেলে। ১৪ তারিখ সেখানে সদলবলে গিয়ে আশ্রয় নিল মালিক সাহেব। তখন ঢাকায় সবাই মনে করছে ওটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়–ভারতীয় বৈমানিকরা কিছুতেই রেডক্রসের পতাকা ওড়া বাড়িতে আক্রমণ করবে না। রেনড সাহেব তার এলাকায় ওদের আশ্রয় দিয়েছে খবর

পাঠালেন জেনিভায়। সেই বার্তায় বলা হলঃ "পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা পদত্যাগ করেছেন এবং রেডক্রস আন্তর্জাতিক অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন। জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে যেন অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। খবরটা যেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে জানানো হয়"।

মালিক এবং তার গোটা "পূর্ব পাকিস্তান সরকারের" এই সিদ্ধান্তের পর নিয়াজির অবস্থা আরও কাহিল হল। ঢাকার উপর তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। আক্রমণ চলছে কামানের। আক্রমণ চলছে বিমানের। প্রধান লক্ষ্য কুরমিটোলা ক্যান্টনমেন্ট। নাগরার বাহিনী তখন টঙ্গির কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং পাক সেনারা শীতলক্ষা নদীর একটা শাখার ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে ওপার থেকে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মূল পাকবাহিনী কিন্তু কামান এবং বিমান আক্রমণে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে কুরমিটোলা ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পূর্বদিকের বাহিনীরাও প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ডেমরায়। নিয়াজি তখনও বলছেঃ "আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব"। নিয়াজি অবশ্য একথাটা বলছিল প্রধানত মারকিনীদের ভরসায়। মারকিনী সপ্তম নৌবহর যে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে খবর চার–পাঁচ দিন আগে থেকেই জানা গিয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় তখন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আগমন নিয়ে জোর জল্পনা–কল্পনা চলছে। মারকিন সরকার যদিও ঘোষণা করলেন যে কিছু আমেরিকান নাগরিককে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। সকলেরই মনে তখন সন্দেহ। সকলেরই মনে তখন প্রশ্ন, প্রেসিডেন্ট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে মারকিন নৌবহরকে আসরে নামাবেন? ঠিক কি উদ্দেশ্যে মারকিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছিল এবং কেনই বা তারা কিছু না করে (বা করতে না পেরে) ফিরে গেল সে রহস্যের এখনও সম্পূর্ণ কিনারা হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই ঢাকায় এইটুকু জানা গিয়েছে যে, ইসলামাবাদের খবর মত ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজি আশা করেছিল যে সপ্তম নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি তার সাহায্যে আসরে নামবে। ইয়াহিয়া নিজে নাকি নিয়াজিকে সে খবর জানিয়েছিল। সেই ভরসায়ই ১৪ তারিখেও নিয়াজি বলে চলেছেঃ একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব।

ওদিকে মিত্রবাহিনী তখন প্রচণ্ডভাবে ঢাকায় সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তারা ঠিক জানে না যে ঢাকার ভেতরের অবস্থাটা কী। অর্থাৎ পাকবাহিনী কীভাবে ঢাকার লড়াই লড়তে চায় এবং ঢাকায় তাদের শক্তিই বা কতটা। সে খবর মিত্রবাহিনী জানে না। নানাভাবে এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা হল। কিন্তু আসল খবরটা কিছুতেই পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল সব ভুল। সেই ভুল খবরগুলির একটাঃ পাকিস্তানীরা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে পরিখা খনন করে হাউস–টু–হাউস লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা খবরঃ ঢাকায় পাকবাহিনীর অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে এবং রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। এই দুটো খবরই ভুল ছিল কিন্তু তখনকার মত এই খবর দুটোই ঠিক মনে হয়েছিল। মিত্রবাহিনী এই অবস্থায় মনে করল যে ঢাকার ভেতরে লড়াই করার জন্য যদি সৈন্যদের এগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি বিমান আক্রমণ চালানো হয় তাহলে লড়াইয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষও মরবে। মিত্রবাহিনী এটা কিছুতেই করতে চাইছিল না। তাই ওইদিনই তারা একদিকে যেমন আবার পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল এবং তেমনি আর একদিকে ঢাকার সাধারণ

নাগরিকদের অনুরোধ জানলে, আপনারা শহর ছেড়ে চলে যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা শহর ত্যাগ করুন। উত্তর এবং পূর্ব–রাজধানীর দুদিকেই তখন আরও বহু মিত্রসেনা এসে উপস্থিত হয়েছে। চাঁদপুরেও আর একটা বাহিনী তৈরী হচ্ছে নদীপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

১৫ ডিসেম্বরঃ আগেই বলা হয়েছে, নিয়াজি মারকিন সপ্তম নৌবহরের সাহায্য আশা করছিল এবং সেই ভরসায়ই দিন গুণছিল। কিন্তু ১৩ বা ১৪ তারিখ কোনও একটা সময়ে নিয়াজি বুঝল "মারকিন সপ্তম নৌবহর" তাকে সাহায্য করতে আসরে নামবে না। এই বিষয়টা ঠিক কখন এবং কীভাবে নিয়াজি জানল সেটা বলা মুশকিল। তবে ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই নিয়াজি সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ওইদিনই সে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল। বিশেষত, মারকিনীদের সঙ্গে। ঢাকার মারকিন দূতাবাসের কর্মীরা সেই প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির মারকিন দূতাবাসে। তাঁরা খবর পাঠালেন ওয়াশিংটনে। তখন ওয়াশিংটন ইসলামাবাদের মারকিন দূতাবাসের কাছে জানতে চাইল, নিয়াজির প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার সমর্থন আছে কিনা? ইসলামাবাদের মারকিন দূতাবাস বহু চেষ্টা করেও সেদিন ইয়াহিয়াকে ধরতে পারল না। ১৫ তারিখ দিল্লীর মারকিন দূতাবাস মারফৎ খবর পৌঁছল ভারত সরকারের কাছে–"নিয়াজি অআত্মসমর্পণ করতে চায়", তবে কতগুলি শর্তসাপেক্ষ। প্রধান শর্ত, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সবাইকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে গ্রেফতার করা চলবে না। ভারত সরকার এ প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন। বললেনঃ শর্তটর্ত নয়, বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পাকবাহিনীকে অবশ্য এ আশ্বাস দিতে রাজি যে যুদ্ধবন্দীরা জেনিভা চুক্তিমত ব্যবহার পাবে। নিয়াজী যে পুরো ভেঙ্গে পড়েছে, ঢাকার যুদ্ধ চালাবার মত মনোবল যে তার বা তার বাহিনীর মোটেই নেই এটা কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখনও জানেন না। ঢাকার ভেতরের খবরাখবর ভারতীয় বাহিনী খুব কমই পাচ্ছিল। নিয়াজির শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় বাহিনী মনে করল, এটা নিয়াজির একটা কৌশল। আসলে সে কিছুটা সময় চাইছে যাতে সপ্তম নৌবহরের সাহায্যে সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্র নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। নিয়াজি যে প্রস্তাব দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার একমাত্র মানে দাঁড়াল যুদ্ধবিরতি–আত্মসমর্পণ নয়। কিন্তু মিত্রবাহিনী তখন বিনাশর্তে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়। দিল্লীর মারকিন দূতাবাস মারফৎ সেই কথা জানিয়ে দেয়া হলঃ "আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল ন'টা পর্যন্ত সময় দেয়া হল। ভারতীয় বিমানবাহিনী ওই সময় পর্যন্ত কোনও আক্রমণ করবে না। কিন্তু মিত্রপক্ষের স্থল ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে। যদি সকাল ৯টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে শুরু হবে"। ঢাকার ভেতরে পাকবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় নিয়াজিকে বলেছিলেনঃ সকাল ন'টার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবেন কিনা। একটা বেতার ফ্রিকোয়েন্সিও বলে দিয়েছিলেন। শোনা যায় নিয়াজি সেদিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেরও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনও ফলই হল

না। ইয়াহিয়া খাঁকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ বাড়ছে এবং পাকবাহিনীতে ত্রাসও বাড়ছে। ঢাকার অসামরিক পাকিস্তানীরাও আত্মসমর্পণের পক্ষে চাপ বাড়াচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটা বিদেশী দূতাবাসও।

১৬ ডিসেম্বর সকালে নিয়াজি আবার কয়েকজন বিদেশী দূতের সঙ্গে কথা বলল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে মানেকশর প্রস্তাবই মেনে নেবেন। তখন শুরু হল ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে বসে নিয়াজি বার বার সেই চেষ্টা করতে থাকল সকাল থেকে। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারল না। গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন খুলে কান পেতে বসে রয়েছে। তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন, ঢাকায় লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাঁদেরও অনেকের প্রাণ যাবে। তাঁরাও তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজি মানেকশর প্রস্তাবে রাজী হয় কিনা। কিন্তু নটার সংবাদে তাঁরা আকাশবাণীর বাংলা খবরে জানতে পারলো নিয়াজি কোনও জবাবই দেয়নি। বিমান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে। জানিয়ে দিয়েছে যে তার বাহিনী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে। তখনই ঠিক হল, বেলা বারোটা নাগাদ মিত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব ঢাকা যাবেন নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে। ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায় মীরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ঢাকা–টাঙ্গাইল রোডের ওপর নাগরার বাহিনী আটকে পড়েছিল। টঙ্গির কাছাকাছি নদীর ওপরের ব্রীজটা পাকিস্তানীরা ভেঙে দিয়েছিল।

১৬ তারিখ ভোরে নাগরার বাহিনী নয়ারহাট ফরেস্ট রোড দিয়ে সাভারের কাছাকাছি এসে ঢাকা–আরিচাঘাট রোডের উপর পড়ল। পাকবাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে আশাই করেনি। তাই ওদিকে কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্থাই রাখেনি। এমন কি, ব্রীজগুলি পর্যন্ত ভাঙেনি। আরিচাঘাট রোডে পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগোলো। মাত্র কয়েক মাইল। প্রথমেই মীরপুর। পাকবাহিনীর জেনারেল জামসেদ সেখানে গিয়ে নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করল। নাগরার বাহিনী ঢাকা ঢোকার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হল। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হল। বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা। ৪–২১ মিনিটে ঢাকার রেস কোর্সে লক্ষ লক্ষ জনতার "জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা পাকবাহিনীর কাছে ততক্ষণে আত্মসমর্পণের নির্দেশ চলে গিয়েছে। সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্টগ্রাম এবং খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান ওই দিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ করেছিল মধুমতী নদীর পূর্ব তীরে। চট্টগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে পড়েছে। আর খুলনায় পাকবাহিনীর একটা অংশ তখন খালিশপুরের অবাঙালী জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে। নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল। ১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে রণাঙ্গনে কি পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো এবং যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থাই বা কি ছিলো সে সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধের দলিল গ্রন্থের ১০ম খন্ডে বলা হয়েছেঃ ৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রতিটি সেক্টর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস, ক্ষিপ্রতা ও অবশ্যম্ভাবী বিজয় দেখে পাকিস্তানী বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। সীমান্ত অঞ্চলে বিরাট এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। সারাদেশে গেরিলা তৎপরতা এতো বৃদ্ধি পায় যে পাকসেনারা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। পরিস্থিতি ক্রমশ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য ভারতের অর্থনীতিতে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। ভারত বৃহৎ শক্তিবর্গকে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বারবার অনুরোধ জানানোর পরও কোন ফলপ্রসূ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বিবিসির সাথে ২ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করে, "পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।" আমেরিকান টেলিভিশন সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১১ আগস্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, "দুটো দেশই এখন যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো।"

ইয়াহিয়া খান প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'লা ফিগারো' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ১ সেপ্টেম্বর বলেন, আমি এই মর্মে সমগ্র বিশ্বকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে তারা যদি মনে করে বিনা যুদ্ধে তারা এক বিন্দু জমি দখল করতে পারবে তবে তারা মারাত্মক ভুল করছে। এর অর্থই হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ।' পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজী ৭ অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস্-এ প্রকাশিত এক ঘোষণায় বলেন 'যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চায়, তাহলে সে যুদ্ধ হবে ভারতের ঘাঁটিতে।' পাকিস্তানী সমরনায়কদের এসব বল্গাহীন বক্তব্যে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো যে ভারতও পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। এমন একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে পাকিস্তান চীন ও আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপ আশা করেছিলো। অবশেষে ইয়াহিয়া ২৫ নভেম্বর আমেরিকান সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করলেন 'আগামী দশদিন পরে আমাকে এই রাওয়ালপিণ্ডিতে বসে থাকতে দেখবেন না। আমি তখন সীমান্তে যুদ্ধ করবো।' ইয়াহিয়া খান তার কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনী ৩ ডিসেম্বর বিকেল পৌনে ছটার সময় অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর ও আগ্রার বিমানবন্দরগুলোতে অঘোষিত বোমবর্ষণ করে সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা করলো।

বাংলাদেশ অসংখ্য নদী-নালার দেশ। আক্রমণকারীকে বিলম্বিত ও প্রতিহত করার জন্য নদী-নালা অত্যন্ত সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি নদী খুবই বিশাল। পাকা

রাস্তা দিয়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে হবে অসংখ্য নদী অতিক্রম করতে হবে। এই বিশাল নদীগুলো সমগ্র দেশকে কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকায় বিভক্ত করেছে। রাস্তার উপরে ব্রীজগুলো ভেঙে দিয়ে আক্রমণকারীকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া বিরাট এলাকা ক্রমাগতভাবে নিচু ও জলাধারে পূর্ণ এই সমস্ত এলাকায় ভারি অস্ত্রসহ অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যুদ্ধ-কৌশল অনুযায়ী পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সব চাইতে বেশি, কারণ সমস্ত পাকা রাস্তা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকেছে এবং বড় বড় নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তাছাড়া পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধের সম্ভার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছিলো।

মেঘালয় সীমান্ত থেকে অপেক্ষাকৃত শক্ত ঘাটির জন্য সৈন্য চলাচল সম্ভব ছিলো। কিন্তু গৌহাটি থেকে শিলং পর্যন্ত একটি মাত্র পাকা রাস্তা এবং তারপরই পাহাড়ী এলাকা দিয়ে সীমান্তে আসার পথ। এই এলাকায় বড় ধরনের সামরিক অভিযান সম্ভব ছিলো না বলেই সৈন্য সমাবেশ ছিলো সীমিত। ত্রিপুরা ও শিলচর এলাকায় গোলাবারুদ ও রসদসম্ভার পর্যাপ্ত মজুত করা হয়নি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত। তারপর একটি মাত্র রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে আগরতলা পর্যন্ত আসা যায়। পরিষ্কারভাবে অনুমান করা যায় যে এখানে বড় ধরনের অভিযান সম্ভব ছিলোনা। অক্টোবরের শেষের দিকে অবশ্য পাকিস্তানীরা ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পারে।

যেভাবেই হোক ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত এলাকায় বাধা দিয়ে বিলম্ব ঘটানোই ছিলো নিয়াজীর পরিকল্পনা সীমান্তে সব কটি পাকা রাস্তার উপরে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করে অগ্রসরমান সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। ১৪০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় শক্ত-ঘাঁটি, প্রচুর গোলাবারুদ এবং রসদপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করে নিয়াজী অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্মিলিত বাহিনীকে বিলম্বিত করতে চাইলেন।

অন্যদিকে সম্মিলিত বাহিনী এইসব শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। প্রথম লক্ষ্য ছিলো ক্ষিপ্রতা ও গতি। বিদ্যুৎ গতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তের সবদিক দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে পাকসেনাদের ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা। তৃতীয়ত; ছড়িয়ে পড়া পাকবাহিনী যেন একত্রিত হয়ে পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি এলাকায় সৈন্য সমাবেশ না করতে পারে তা নিশ্চিত করা চতুর্থতঃ পাকা রাস্তা বাদদিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানী প্রতিরক্ষাব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া। পঞ্চমতঃ মনস্তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতে হবে-যাতে তারা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানী সমরনায়করা সম্ভবত ভেবেছিলেন ভারত বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি জেলা বা মহকুমা শহর দখল করেই ক্ষান্ত হবে। সম্ভবত এই কারণেই তারা সীমান্ত এলাকায় শক্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা করেন। পাকিস্তানী জেনারেলরা যুদ্ধের গতিও পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। ফলে, ঢাকা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধা দিতে ব্যর্থ হয় পাকবাহিনী বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পলায়নপর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানীদের সৈন্য সমাবেশ ছিলো নিম্নরূপঃ নবম ডিভিশন জেনারেল আনসারীর নেতৃত্বে যশোর

এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ১০৭ ব্রিগেড যশোরে এবং ৫৭ ব্রিগেড ঝিনাইদহে অবস্থিত ছিলো। এছাড়া ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও একটি রেকি এবং সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন ছিলো। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে উত্তর বাংলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৬ ডিভিশনের সদর দফতর নাটোরে অবস্থিত ছিলো। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে এবং ২০৫ ব্রিগেড বগুড়া এলাকায় মোতায়েন করা হয়। একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ২টি মর্টার ব্যাটালিয়ন, একটি রেকি ও রিপোর্ট ব্যাটালিয়ন, একটি আর্মার্ড রেজিমেন্ট ছিলো। মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজীর নেতৃত্বে চতুর্দশ ডিভিশনকে পুর্বাঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে মেজর জেনারেল জামসেদের নেতৃত্বে ৩৬ ডিভিশন ঢাকায় ও মেজর জেনারেল রহিমের নেতৃত্বে ৩৯ ডিভিশন চাঁদপুর গড়ে তোলা হয়। অবশ্য এই দু'টি ডিভিশন কোনক্রমেই শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেনি, কারন বিভিন্ন ইউনিট পুনর্বিন্যাস করেই এই ডিভিশন দুটি গড়ে তোলা হয়। ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লায়, ২৭ ব্রিগেড ময়মনসিংহে ও ২১২ ব্রিগেড সিলেটে মোতায়েন করা হয়। সিলেটে একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও দুইটি মর্টার ব্যাটারী ও মাত্র চারটি ট্যাংক ছিলো। চট্টগ্রামে ৯৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড অবস্থিত ছিলো যার অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আতাউল্লা। অপর দিকে ভারতীয় ইস্টার্ণ কমাণ্ডার অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ছিলো তিনটি নিয়মিত কোর, একটি কমিউনিকেশন জোন ও প্রায় এক লাখ মুক্তিযোদ্ধা সমন্বিত ১১টি সেক্টর। কৃষ্ণনগরে ছিলো দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর। লেঃ জেনারেল টি, এন, রায়না ছিলেন কোর কমাণ্ডার, এতে ছিলো নবম ও চতুর্থ পার্বত্য ডিভিশন। এছাড়া ছিলো টি-৫৫ (রাশিয়ান) ট্যাংকে সমন্বয়ে গঠিত একটি মাঝারি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পিটি-৭৬ (রাশিয়ান) ট্যাংক সজ্জিত একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট, ১৩০ মিলিমিটার (রাশিয়ান) একটি মাঝারি গোলন্দাজ ইউনিট ও একটি ব্রিজিং ইউনিট। তেত্রিশ কোরের সদর দপ্তর ছিলো শিলিগুড়িতে। লেঃ জেনারেল এম, এল, থাপান ছিলেন এই কোরের কমাণ্ডার। ৬ পার্বত্য ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এ ছাড়া পিটি-৭৬ (রোশিয়ান) ট্যাংকে সমন্বয়ে একটি হালকা আর্মার্ড রেজিমেন্ট, একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫৫´) ও একটি ইঞ্জিনিয়ার ব্রিজিং ইউনিট ছিলো। চতুর্থ কোরের সদর দপ্তর ছিলো আগরতলায় লেঃ জেনারেল সগত সিং এই কোরের কমাণ্ডার ছিলেন। অষ্টম, সাতান্ন ও তেইশ পার্বত্য ডিভিশন নিয়ে এই কোর গঠিত হয়। এছাড়া দুই স্কোয়াড্রন পিটি-৭৬ ট্যাংক ও একটি মাঝারি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট (বৃটিশ ৫৫´) ছিলো। ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সদর দপ্তর ছিলো গৌহাটিতে। মেজর জেনারেল জি, এস, গিল ছিলেন এর কমাণ্ডার। যুদ্ধে জেনারেল গিল আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। একটি পদাতিক ব্রিগেডের সমান ছিলো এর আকার ও শক্তি। এছাড়া সমস্ত সীমান্ত এলাকা জুড়ে ছিলো মুক্তিবাহিনীর ১১টি সেক্টর। দ্বিতীয় কোর ফ্রন্টে জেনারেল---কমাণ্ডে দুই ডিভিশন সৈন্য গোমতি নদীর দিকে ধাবিত হয়। পদ্মা থেকে শাখা নদী মধুমতি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবন এলাকায় পতিত হয়েছে। এই ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিলো পদ্মার পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত এলাকা মুক্ত করা। দ্বিতীয় কোর কমাণ্ডার পাকিস্তানী শক্তির উপরে আক্রমণ অব্যাহত রেখে দ্রুতগতিতে একাধিক দলে মধুমতির দিকে অগ্রসর হওয়ায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে, অন্য একটি মাগুরা হয়ে যশোর বনগাঁর এবং অপর একটি দল খুলনা ও

বরিশালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আট নম্বর সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মনজুরের নেতৃত্বে আগেই মুক্তিবাহিনী চৌগাছা দখল করে। ২৪ নভেম্বর সংঘটিত চৌগাছা যুদ্ধে পাকসেনারা ৪টি শাফি ট্যাংক হারায়। একটি ভারতীয় ব্রিগেড ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে। একইভাবে কুষ্টিয়ার পথে দর্শনা আক্রমণ করা হয়। আট নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের তিন তারিখে শিংহঝুলিতে পৌছায়। ঝিকরগাছার পতন হয় ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে। তারপর তিনদলে বিভক্ত হয়ে যশোর আক্রমণ করা হয়। উত্তর দিকের দলটি যশোর-ঝিনাইদহ সড়ক ধরে আক্রমণ অব্যাহত রাখে। মধ্যবর্তী দলটি ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চিতের বিল এলাকা দিয়ে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ দিকে বেনাপোল-যশোর সড়কে অগ্রসর হয় অপর একটি দল। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে কোটচাঁদপুরে যশোর-কুষ্টিয়া রেলওয়ে জংশন দখল করে রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অগ্রসরমান এই দলটি উত্তর দিকে ধাবিত হয় এবং ৭ ডিসেম্বর আরও ৩০ মাইল অগ্রসর হয়ে ঝিনাইদহ দখল করে। ঝিনাইদহ যুদ্ধে মেজর মুস্তাফিজ আহত হন।

লেঃ জেনারেল নিয়াজী ৫ ডিসেম্বর রাতে পাকবাহিনীকে পেছনে সরে আসতে নির্দেশ দেন। সম্ভবত ঢাকার পথে পেছনে এসে মেঘনার তীরে সৈন্য সমাবেশ করে ঢাকা রক্ষা করার পরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু তা আর সম্ভব ছিলো না, মিত্রবাহিনীর একটি দল খুলনার দিকে এবং অপর একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে অভিযান অব্যাহত রাখে। পাকিস্তানী নবম ডিভিশন যশোর সেনানিবাস ছেড়ে মাগুরার দিকে চলে যায়। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। পরবর্তীকালে মেহেরপুর দখলের পরে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার দিকে যাত্রা অব্যাহত থাকে। ডিসেম্বরের ১২ তারিখে ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের সংঘর্ষ হয়। লেঃ সিদ্দিকী ও ক্যাপ্টেন হুদা এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। লেঃ সিদ্দিকী ১৪ ডিসেম্বর এই যুদ্ধে একটি চোখ হারান। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে এবং ১৮ ডিসেম্বর ১৫০জন পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। মেজর জলিলের নেতৃত্বে নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী বীর বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলো। ৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরা শত্রুমুক্ত হয়। ১০ ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনী খুলনা দখল করে। ৭ ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত হয় এবং পাকসেনারা ক্যাপ্টেন বেগ ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হায়াত তার সৈন্যসামন্তসহ আত্মসমর্পণ করে। ৩৩ কোর ফ্রন্টে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দল পাকিস্তানী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোকে আক্রমণ করে এবং মুল আক্রমণ পরিচালিত হয় হিলিতে। একটি ব্রিগেড জলপাইগুড়ি সীমান্তে এবং অন্য একটি ব্রিগেড কুচবিহার সীমান্তে অবস্থিত পাকঘাঁটি আক্রমণ করে। এক ডিভিশন সৈন্য হিলি আক্রমণ করে। হিলিতে পাকসেনারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে পীরগঞ্জ ও খানপুর দখল হয়। ৭ ডিসেম্বর লালমনিরহাট শত্রুমুক্ত হয়। দুর্গাপুর ৮ ডিসেম্বর দখল হয় এবং ৯ ডিসেম্বর রংপুর ও দিনাজপুর পাকঘাঁটি আক্রমণ করা হয়। মিত্রবাহিনীর একট দল হিলিকে এড়িয়ে পলাশবাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। উইং কমান্ডার এম, কে, বাশারের নেতৃত্বে ছয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ৫ ডিসেম্বর ধরলা নদী অতিক্রম করে কুড়িগ্রাম দখল করে। পাকসেনারা কুড়িগ্রাম থেকে পালিয়ে লালমনিরহাটে চলে যায়। ৬ ডিসম্বের তিস্তা নদীর তীরে মুক্তিবাহিনী অবস্থান নেয়। ৩ ডিসেম্বর তারিখে ভজনপুর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা ঠাকুরগাঁও বীরগঞ্জ দলখ করে। ১২ ডিসেম্বর রংপুর

ও সৈয়দপুর সেনানিবাস ছাড়া সমগ্র এলাকা মুক্তিবাহিনীকে দখলে আসে। পাকসেনারা ১৭/১৮ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।
সাত নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা নবাবগঞ্জের দিকে অভিযান শুরু করে। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয়। অপর একটি দল লেঃ রফিকের নেতৃত্বে মহানন্দা নদী অতিক্রম করে রোহনপুর–নাচোল–আমনুরা বরাবর অগ্রসর হয়ে নবাবগঞ্জ আক্রমণ করে। অপর একটি দল লেঃ রশিদের নেতৃত্বে গোমস্তাপুর হয়ে নবাবগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৩ ডিসেম্বর বারঘরিয়ার নদী অতিক্রম করে প্রতিটি বাংকার চার্জ করার সময় এই নির্ভীক যোদ্ধা শহীদ হন। এই সেক্টরের সৈন্যরা হিলি থেকে বগুড়া হয়ে দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়। মেজর গিয়াসের নেতৃত্বে লালগোলা সাবসেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মা নদী পার হয়ে রাজশাহী আক্রমণ করে এবং শেখ পাড়া সাব–সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রশিদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর অপর একটি দল পাবনা অভিমুখে যাত্রা করে। পাকসেনারা রাজশাহী ছেড়ে নাটোর আশ্রয় নেয়। ১৭ ডিসেম্বর সমবেত পাকসেনারা নাটোরে আত্মসমর্পণ করে।
এদিকে যশোর দখলের পর লেঃ আকতার কালিগঞ্জের দিকে এবং লেঃ অলিক কুমার গুপ্ত ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হয়। মিত্রবাহিনী খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। রূপদিয়া ও নোয়াপাড়া দখলের পর শিরমনিতে যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে পাকিস্তানী ১৫ এফ এফ রেজিমেন্ট সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। পশ্চিমে জলাধার অপর পূর্বদিকে নদী। পাকসেনারা এখানে প্রবলভাবে বাধা দিতে সক্ষম হন। পাঁচদিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শিরমনির পতন হয় ১৬ ডিসেম্বর সকালে। মেজর জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রূপসা নদীর তীরে এসে পৌঁছায় এবং খুলনা আক্রমণ করে। ৭ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার পতন হয় নবম সেক্টর সৈন্যরা লেঃ হুদার নেতৃত্বে এবং অষ্টম সেক্টর সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে সাতক্ষীরা দখল করে। ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহি, ফ্লাইং অফিসার কালাম ও লেঃ নূরুন্নবী কুষ্টিয়ায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মেজর আযম চৌধুরী দুই কোম্পানী যোদ্ধা নিয়ে ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর দখল করেন ও পরদিন চুয়াডাঙ্গা শত্রুমুক্ত করেন। ফরিদপুরের দিকে অগ্রসরমান যৌথ বাহিনী কামারখালি ঘাটে ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানীদের সাথে সংঘর্ষে আসে। মধুমতি নদীর সকল সম্ভাব্য অতিক্রম স্থানে পাকসেনারা প্রহরারত ছিলো। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে নৌকা সংগ্রহ করে ১৪ এপ্রিল মধুমতি নদী অতিক্রম করে মুক্তিবাহিনী পাকসেনাদের পিছু হটিয়ে দেয়। মিত্রবাহিনী এয়ারব্রিজ অপারেশন করে মধুমতি অতিক্রম করে। চার নম্বর সেক্টর এলাকায় ৭ ডিসেম্বর পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে দরবস্ত ছেড়ে হরিপুরে পলায়ন করে। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী নদী পার হয়ে মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে মুক্তিবাহিনী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী হরিপুর আক্রমণ করে এবং ১৩ ডিসেম্বর হরিপুর শত্রুমুক্ত হয়। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে পাকিস্তানী ঘাঁটি খাদিমনগরের ডান দিক থেকে মুক্তিবাহিনী ও বাম দিক থেকে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ করে। সিলেট মুক্ত হয় ১৭ ডিসেম্বর। পাঁচ নম্বর সেক্টরে ৩ ডিসেম্বর গোয়াইনঘাটে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয়। ৩ ডিসেম্বরেই গোয়াইনঘাট মুক্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ থেকে মৌলবীবাজার হয়ে সিলেটের পথে যাত্রা শুরু করে মিত্রবাহিনী। ৬ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ মুক্ত হয়। সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শওকত

ছাতক আক্রমণ করেন ৭ ডিসেম্বর এবং ঐ দিনই রাত আটটায় ছাতক দখল হয়। মেজর শাফায়াত জামিল সালুটির বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ৯ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী। ১৫ ডিসেম্বর এই বাহিনী বিশ্বনাথ দখল করে। প্রায় তিনশ' মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে ক্যাপ্টেন নবী রাধানগর গোয়াইনঘাট আর্টিলারী সাপোর্ট ছাড়াই আক্রমণ করে তা দখল করেন। এর আগে ভারতীয় গুর্খা রেজিমেন্ট দুইবার আক্রমণ করে বিফল হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে মেজর রফিকুল ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা হয়েছেঃ ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী উত্তরে মেঘালয় সীমান্ত থেকে ত্রিপুরার দক্ষিণে ফেনী পর্যন্ত ২৪০ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ধাবিত হয়। এই কোরের দায়িত্ব ছিলো সুরমা নদী থেকে মেঘনার পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করা। চট্টগ্রামে যাওয়ার রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে মেঘনা পার হয়ে ঢাকার পথে অভিযান চালনার পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক জেনারেল সগত সিং এক ডিভিশন সৈন্য শিলচর-করিমগঞ্জ হয়ে সিলেটের দিকে পাঠান। অপর ডিভিশনটি তিন দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম দলটি কুমিল্লা আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং অন্য দল দুটির একটি লাকসাম-চাঁদপুর এলাকায় এবং অপরটি ফেনী থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে। মুক্তিবাহিনী করিমগঞ্জ জয় করে মুন্সীনগরের দিকে এগিয়ে চলে। মুন্সী নগরের পতন হয় ৫ ডিসেম্বরে। এরপর একটি দল মৌলবীবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। ডিসেম্বর ৮ তারিখে মৌলবীবাজার দখল হয়। অন্য একটি দল সিলেট অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। সিলেট আক্রমণ সহজসাধ্য ছিলো। নদী অতিক্রমের জন্য যথেষ্ট ব্রীজ তৈরির যন্ত্রাদি ছিলো না। রাতের অন্ধকারে হেলিকপ্টারের সাহায্যে এয়ার ব্রিজিং অপারেশন শুরু হয়। পরদিন সকালে এই দলটি সিলেটের উপকণ্ঠে আসতে সক্ষম হয়। চতুর্থ কোরের যে ডিভিশনটি আখাউড়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে- জেনারেল সগত সিং মেঘনা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। মুক্তিবাহিনীর তিন নম্বর সেক্টর ও এস ফোর্স তখন আখাউড়ায় পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। আখাউড়া রেলওয়ে লাইন আশুগঞ্জের দিকে চলে গেছে। চলাচলের কোনো রাস্তা ছিলো না। শায়েস্তাগঞ্জ থেকে ভৈরববাজার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ নদী একটি বিরাট বাধা হিসেবে দেখা দেয়। অগ্রবর্তী ব্রিগেড আখাউড়া ঘিরে ফেলে এবং গঙ্গাসাগরের দিকে এগিয়ে চলে। এই সময়ে পাকিস্তানী স্যাবরজেট বিমানগুলো হামলা চালায়। ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাল্টা আক্রমণ চালালে পাকিস্তানী বিমানগুলো পালিয়ে যায়। ৫ ডিসেম্বর আখাউড়ার পতন হয়। ভারতীয় ৩১১ পার্বত্য ব্রিগেড, ৭৩ পার্বত্য ব্রিগেড তখন নরসিংদীতে অবস্থান করছিলো। মিত্রবাহিনী ১২ ডিসেম্বর ডেমরা দখল করে। 'এস' ফোর্স পদব্রজে বোলতাপুল হয়ে রূপগঞ্জ দিয়ে বাদু নামক স্থানে নদী অতিক্রম করে ডেমরা পৌঁছায় ১৩ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। 'কে' ফোর্স দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল চট্টগ্রামের দিকে এবং অপর দল চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হয়। দশম ইস্ট বেঙ্গল মিত্রবাহিনীর ১৩ ব্রিগেডের সাথে যৌথভাবে ফেনী শহর দখল করে। এই বাহিনীকে নোয়াখালী সদরে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী বাধা দেয় কিন্তু তীব্র আক্রমণের মুখে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ঐদিনই তারা চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। ফেনী থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ছিলো মাত্র ৬৫ মাইল। যৌথ বাহিনী ১৩ ডিসেম্বর কুমিল্লা পৌঁছায় দুপুর বারোটায়। ক্যাপ্টেন আইনুদ্দিনের নেতৃত্বে নবম বেঙ্গল এবং ক্যাপ্টেন

গাফফারের নেতৃত্বে চতুর্থ বেঙ্গল প্রবল পরাক্রমে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'এস'ফোর্স কমান্ডার লেঃ কর্ণেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আখাউড়ার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রেখে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী 'এস' ফোর্স মাধবপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল পৌঁছায় ডিসেম্বরের ৮ তারিখে। আখাউড়ার যুদ্ধে লেঃ বদিউজ্জামান শহীদ হন। পরিকল্পনা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে একটি দল শহরে ঢুকবে, অপর দল উত্তর দিক থেকে সিলেট সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছাবে–আর মিত্রবাহিনী আখাউড়া–ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেললাইন এবং উজানী ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক হয়ে অগ্রসর হবে। 'এস' ফোর্সের ১১ বেঙ্গলকে চান্দুরার উত্তরে একটি রোড ব্লক করতে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে সিলেট থেকে পলায়নপর পাকসেনারা এদিকে না আসতে পারে। মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া চান্দুরার উত্তরে রোড ব্লক করে চান্দুরা থেকে সরাইল পর্যন্ত এলাকা শত্রুমুক্ত করেন। ১১ বেঙ্গল পাইকপাড়ায় এলে মেজর নাসিম শাহবাজপুর, সরাইল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানীদের একটি গাড়ী তেলিয়াপাড়া থেকে মেজর ভুঁইয়াকে অতিক্রম করে চলে আসে। 'এস' ফোর্স কমান্ডার নিজেদের গাড়ী মনে করে গাড়ী থামান। গাড়ী থামলে দেখা গেল গাড়ীতে পাকসেনা। পাকিস্তানী সুবেদারের সাথে কর্ণেল শফিউল্লার হাতাহাতি শুরু হয়। পাকসেনার গুলীবর্ষণে কর্ণেল শফিউল্লার কোমরের পিস্তলটি বিধ্বস্ত হলো কিন্তু অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। মেজর নাসিমসহ ১১ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর মতিন ১১ বেঙ্গলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ৭ ডিসেম্বর পাইকপাড়া এসে পৌঁছায় 'এস' ফোর্স। মেজর সুবেদ আলী ভুঁইয়া ৭/৮ ডিসেম্বর শাহবাজপুর আক্রমণ করে শত্রুমুক্ত করেন। ৮ ডিসেম্বর মেজর ভুঁইয়া ও 'এস' ফোর্সের দলটি সরাইল হয়ে আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। পাকবাহিনীর ১৪ ডিভিশন সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলো। ১০ ডিসেম্বর ১৮ রাজপুত রেজিমেন্ট পাকিস্তানী ব্যুহ ভেদ করে আশুগঞ্জে ঢুকে পড়ে। 'এস' ফোর্স ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা বিপুল বিক্রমে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০/১১ ডিসেম্বর পাকসেনারা আশুগঞ্জ ছেড়ে ভৈরব চলে যায় এবং ভৈরব ব্রিজটি ধ্বংস করে। ১১ ডিসেম্বর ভারতীয় ১০ পাঞ্জাবকে হেলিকপ্টার যোগে নদীর অপর পাড়ে নামানো হয়। দ্বিতীয় বেঙ্গল ও তিন নম্বর সেক্টর সৈন্যরা পায়ে হেঁটে নরসিংদী অগ্রসর হয়। ১১ বেঙ্গল ভৈরব অবরোধ করে রাখে।
কুমিরাতে পাক ঘাঁটি ছিলো খুবই শক্তিশালী। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম দশম বেঙ্গলের এক কোম্পানী কুমিরায় রেখে পাহাড় পার হয়ে হাটহাজারী যাত্রা করেন। ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী হাটহাজারী পৌঁছে যায়। চতুর্থ বেঙ্গল চট্টগ্রাম–রাংগামাটি সড়ক দিয়ে হাটহাজারীর সন্নিকটে এসে পড়ে। নবম বেঙ্গলও এখানে এসে পৌঁছায়। ১৫ ডিসেম্বর হাটহাজারীতে অবস্থানরত পাকসেনাদের ওপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানী অফিসার মেজর হাদী তার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে পাকসেনারা কুমিরা ছেড়ে ফৌজদারহাটে এসে অবস্থান নেয়। সম্মিলিত বাহিনী ফৌজদারহাট আক্রমণ করে। ১৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অবস্থানরত পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করে।
এক নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে ছাগলনাইয়া দখল করে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ 'কে' ফোর্সের সাথে যোগ দিয়ে ফেনী–চট্টগ্রাম সড়ক ধরে একটি দল

মুহুরী নদী ধরে এবং অপর দলটি চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন মাহফুজ সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ৯ ডিসেম্বর জোরারগঞ্জ এসে পৌছায়। জোরারগঞ্জ যুদ্ধে ১২জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে পিছু হটতে থাকে। শুভপুর ব্রিজটি পলায়নপর পাকবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। সীতাকুন্ড দখলের জন্য ক্যাপ্টেন মাহফুজ ডান দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং মিত্রবাহিনী সম্মুখভাগে এগিয়ে চলে। যৌথবাহিনী চন্দ্রকান্তের মন্দিরে এসে পৌছলে পাকসেনারা আর্টিলারীর সাহায্যে প্রবলভাবে বাধা দেয়। ১১ ডিসেম্বর সীতাকুন্ডের পতন হয়। ১৪ ডিসেম্বর এই বাহিনী কুমিরায় অবস্থানরত দশ বেঙ্গলের সাথে যোগদান করে। চতুর্থ কোর ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে দ্রুতগতিতে ঢাকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অপর একটি দল চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় কোর ও মুক্তিবাহিনী মধুমতি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে। একটি দল মাগুরার দিকে ও অন্য দলটি যশোর দখলের পর খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। ১ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী ফরিদপুর দখল করে। দৌলতপুরের পতন হয় একই দিনে। পাকসেনাদের কুষ্টিয়া–যশোরের দিকে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর–পশ্চিম দিকে লালমনিরহা–টের পতন হয়। এর আগে জয়মনিরহাট যুদ্ধে লেঃ সামাদ শহীদ হন। ১২ ডিসেম্বর ঘোড়াঘাট দখল হয় এবং মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গোবিন্দপুর পরদিন শত্রুমুক্ত হয়। ১৪ ডিসেম্বর বগুড়ার পতন হয়। ১০১ কমিউনিকেশন জোন এলাকায় সম্মিলিত বাহিনী তুরা থেকে জামালপুরের দিকে ধাবিত হয়। পাকবাহিনীর একটি ব্রিগেড এই এলাকায় মোতায়েন ছিলো। ব্রিগেড সদর দপ্তর ও দুইটি ব্যাটালিয়ন ময়মনসিংহে এবং একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। ডিসেম্বর ৯ তারিখে সম্মিলিত বাহিনী জামালপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌছে যায়। একটি দল ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে জামারপুরে পাকসৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পাকবাহিনী ময়মনসিংহ থেকে একটি ব্যাটালিয়ন জামালপুরে স্থানান্তরিত করে।

১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ি হয়ে ময়মনসিংহের দিকে ধাবিত হয়। ৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ শত্রুমুক্ত হয়। জামালপুরে মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকসেনাদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১১ ডিসেম্বর পাকবাহিনী পরাজিত হয়। মেজর জেনারেল গিল গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর জেনারেল নাগরা অধিনায়ক নিযুক্ত হন। পাকসেনাদের একটি দল টাঙ্গাইল চলে যায়। সম্মিলিত বাহিনী টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হয়। ১২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে ছত্রী সেনার একটি ব্যাটালিয়ন অবতরণ করে। জামালপুর যুদ্ধে পরাজিত পাকসেনারা টাঙ্গাইলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। পাকিস্তানীদের পালাবার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কারণ ১০১ কমিউনিকেশন জোনের সৈন্যরা টাঙ্গাইলে পৌছে যায়। ১৩ ডিসেম্বর পাকবাহিনী টাঙ্গাইলে আত্মসমর্পণ করে। পলায়নপর বিপুল সংখ্যক পাক সৈন্য গ্রামবাসীদের হাতে নিহত হয়। সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার পথে মির্জাপুরের দিকে যাত্রা করে। ১৪ ডিসেম্বর যৌথ দল টঙ্গীর কাছাকাছি এসে পড়ে। এই বাহিনী কালিয়াকৈর হয়ে সাভার এসে পৌছায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্মিলিত বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে মীরপুর ব্রীজের কাছে এসে পড়ে। ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০–৪০ মিনিটে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। জেনারেল নাগরা তার এডিসি'র মারফত নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়ে পত্র পাঠান।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী ১৪ ডিভিশন কমাণ্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ মীরপুর ব্রিজের

কাছে এসে ভারতীয় জেনারেল গান্ধর্ব নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়গান ও উল্লাসের মধ্যে ঢাকা দখল করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পুর্বাঞ্চলে মাত্র এক স্কোয়াড্রন ১৮ স্যাবর জেট বিমান ছিলো। সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানীরা বিমান শক্তি সম্পুর্ণভাবে হারায়। ভারতীয় বিমানবাহিনী একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে। ভারতীয় নৌবাহিনী ফ্লিট এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার 'ভিক্রান্ত' বঙ্গোপসাগরে ঢুকে সমুদ্র পথের গতিরোধ করে। 'ভিক্রান্ত' থেকে যুদ্ধ বিমানগুলো চট্টগ্রাম বন্দর, বিমান বন্দর ও চালনা বন্দর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ জাহাজের প্রধান কর্তব্য ছিলো সমুদ্র পথে পাকসেনাদের পালিয়ে যেতে না দেয়া এবং সমুদ্র পথে কোনো সাহায্য যাতে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা। পাকিস্তান পুর্বাঞ্চলীয় নৌ-বাহিনীর কয়েকটি মাত্র গানবোট সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১২ অক্টোবর 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামে দু'টি গানবোট সমন্বয়ে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সংযোজিত করা হয়। ৬ ডিসেম্বর যশোরের পতনের পর 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এবং একটি ভারতীয় গানবোট 'পানভেল' হিরণপয়েন্টমংলা বন্দর এবং খুলনার খালিশপুরে পাক নৌ-ঘাঁটি পি, এন, এস 'তিতুমীর' দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ৯ ডিসেম্বর কোনো বাধা ছাড়াই এই গানবোটগুলো হিরণপয়েন্ট পৌছায়। পরদিন ১০ ডিসেম্বর অভিযান শুরু হয়। বেলা ১২টার সময় খুলনা শিপইয়ার্ডের সন্নিকটে আকাশে তিনটি জংগী বিমান দেখা দেয়। ভারতীয় নাবিক বলেন যে, বিমানগুলো ভারতীয়। আকস্মিকভাবে জংগী বিমানগুলো বোমাবর্ষণ শুরু করে। ভারতীয় নাবিক সবাইকে জাহাজ ত্যাগ করতে বলেন। ইঞ্জিন আর্টিফিসার মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন উপরে এসে চীৎকার করে জানতে চান 'জাহাজ থামতে কেন বলা হয়েছে। আমরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই এগিয়ে যাবোই।" বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন 'পলাশ'-এর উপরে পাকিস্তানী বোমাবর্ষণের ফলে শহীদ হন। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রস্তাব পাস করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে। ইয়াহিয়া খান প্রত্যাশিত আমেরিকান ও চীনের সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে বঞ্চিত হন। পাকিস্তানী এক লক্ষ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিবাহিনীর পরম বিজয় সুচিত হলো-পৃথিবীর মানচিত্রে সংযোজিত হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন এম, এ, জি ওসমানি। যুদ্ধজয়ের পরে ১৯৭২ সালে জেনারেল ওসমানি দৈনিক বাংলাকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে মুক্তিবাহিনী কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল এবং তারা কোন ধরনের রনণীতি ও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার উত্তরে বলেনঃ সর্বপ্রথমে যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং

যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাকে কব্জা করতে না দেয়ার জন্যে নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এ-জন্যে পদ্ধতি ছিল–যত বেশী বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে, যেসব প্রতিবন্ধক রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে এবং এর সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানা হবে। মূলতঃ এই পদ্ধতি ছিলো নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতি। সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ রয়েছে। যথাঃ ভৈরব–আশুগঞ্জের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে শত্রু পুরো দু'টো বিগ্রেড নিয়োগ করে এখানে শত্রুবাহিনীকে চারদিন আটকে রাখা হয়। তবে একটা বিষয় আমি আলোকপাত করতে চাই। নিয়মিত বাহিনীর যেটা স্বাভাবিক কৌশল তা আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমরা ছোট ছোট অংশে অর্থাৎ ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুবাহিনীর তুলনামূলক অধিক সংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখি এবং সাথে সাথে শত্রুর ওপর আঘাতও হানতে থাকি। এভাবে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সর্বপ্রথমে যুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় আমার ও আমার অধিনায়কদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমরা কেবলমাত্র নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে চলতে পারব না। কারণ আমাদের সংখ্যা তখন সর্বমোট ৫টি ব্যাটালিয়ন। এছাড়া আমাদের সাথে প্রাক্তন ইপিআর-এর বাঙ্গালী জওয়ানেরা, আনসার, মোজাহেদ, পুলিশ ও যুবকরাও ছিলেন। যুবকদের অস্ত্র দেয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমরা ভেতর থেকে যে অস্ত্রগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মোটামুটি প্রশিক্ষণ দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শত্রু বাহিনীর ছিলো তিন–চারটি ডিভিশন। এই তিনটি ডিভিশনকেই নিম্নতম সংখ্যা হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে, এদেরকে প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয়, সম্ভব নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ এটি আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি বিরাট গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই গণবাহিনী শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিউট্রালাইজ করবে এবং এই গণবাহিনী এরকম হতে হবে যেমন মানুষের পেটের অন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী জীবাণু অন্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে তেমনি ভেতর থেকে শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী শত্রুর অস্ত্রগুলো বিনষ্ট করে দেবে। এছাড়া শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের সংখ্যা বেশী, তাদের অস্ত্র বেশী, তাদের বিমান রয়েছে। আর আমাদের কাছে বিমান ছিলো না। কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার ছিলো যে বইয়ে লেখা ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বিশেষ কিছু উদ্ধার করার থাকবে না। সেজন্যে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এটাও আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো যে আমাদের একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সময় কমাবার জন্যে। সেই পদ্ধতিতে বড় একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁতে আঘাত করতে হবে এবং সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট অর্থাৎ কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে তাকে বাধ্য করতে হবে–সে যেন কনসেনট্রেটেড না থেকে ডিসপার্সড হয়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ছোট ছোট

টগিতে তার ফোর্সকে কমিট করতে বাধ্য হবে এবং তখন গেরিলা পদ্ধতিতে তার যোগাযোগের রাস্তা, তার সংযোগের রাস্তা, তার রি-ইনফোর্সমেন্টের রাস্তা ধ্বংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেট বা বিচ্ছিন্ন করা যাবে। এজন্যে আমার অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিলো। এই প্রয়োজনের কথা আমি মে মাসের শুরুতে সরকারকে লিখিতভাবে জানাই এবং এর ভিত্তিতে মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যও চাই। তাতে আমার উদ্দেশ্য ছিলো-(ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা সমন্বিত বাহিনী ও (খ) ২৫ হাজারের মতো নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্বর গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এক দিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমাণ্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তিকে বন্টন করার জন্যে বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।

এই পদ্ধতি আমরা কার্যে পরিণত করি। ক্রমশঃ গড়ে উঠলো একটি বিরাট গণবাহিনী-গেরিলা বাহিনী। জুন মাসের শেষের দিক থেকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। প্রথমে বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি বানানো হয় এবং জুন মাসের শেষের দিক থেকে আমাদের গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী এ্যাকশনে নামে। তবে, জুলাই আগষ্ট-মাসের আগ পর্যন্ত শত্রুবাহিনী তাদের ওপর গেরিলা বাহিনীর প্রবল চাপ বুঝতে পারেনি। যদিও শুরু থেকে আমরা কিছু সংখ্যক যুবকে ট্রেনিং দিয়ে ভেতরে পাঠিয়েছিলাম। তারা চট্টগ্রাম বন্দরেও গিয়েছিলো, ঢাকায়ও এসেছিলো। তবে গেরিলাদের শত্রুরা জুলাই মাস থেকে অনুভব করতে শুরু করে। এর সাথে সাথে আরেক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমাদের নৌবাহিনী ছিলো না। আমার কাছে নিয়মিত নৌবাহিনীর বহু অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার ও নাবিক আসেন। ফ্রান্সের মতো জায়গা থেকে কয়েকজন পাকিস্তানের ডুবোজাহাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। আমি তাদেরকে ভিত্তি করে এবং আমাদের বড় শক্তি যুব শক্তিকে ব্যবহার করে নৌকম্যাণ্ডো গঠন করি। এই নৌকম্যাণ্ডো জলপথে শত্রুর চলাচল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ১৪ আগষ্ট থেকে আমাদের এই নৌকম্যাণ্ডোদের আক্রমণ শুরু হয়। তারা যে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই। তারা মঙ্গলায় বহু জাহাজ ডুবায়। তারা শত্রুর জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র-সমান নিয়ে যেসব জাহাজ আসছিলো চট্টগ্রামে সেগুলো ধ্বংস করে। এজন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজন ছিলো। তারা শত্রুর দুটো বন্দর অচল করে দেয় এবং নদীপথেও তাদের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। আমাদের কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষনাগাদ শত্রু রক্তহীন হয়ে ওঠে। তার ২৫ হাজারের মতো সৈন্য বিনষ্ট হয়। বহু যানবাহনের লোকসান হয়। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুর এ অবস্থা দাঁড়ায় যে একজন বক্সার রিক্ত এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে ক্লান্ত হয়ে ঘুরছে এবং একটা কড়া ঘুষি খেলে পড়ে যাবে-তার যোগাযোগের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। যেভাবে আমার উদ্দেশ্য ছিলো সেভাবে বিভিন্ন জায়গায় তারা ছোট পকেট বানিয়েছিলো। তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে রি-ইনফোর্স কংক্রিটের বাংকার বানিয়েছিলো। সেগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে ছিলো। রাতের বেলা বেরুতো না, দিনের বেলাও বেশী সংখ্যক লোক ছাড়া বেরুতো না। শত্রুর তখন এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

অক্টোবর নভেম্বর থেকেই শত্রু যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। যাতে

তাদের জান বাঁচে, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের পরে একটা যুদ্ধবিরতি হয়, অবজারভার এসে যায় এবং জাতিসংঘের কাছে সমস্যাটি দিয়ে তাদের জান রক্ষা হয়–শত্রু পক্ষের এই ছিলো প্রচেষ্টার কারণ, তখন তারা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে তাদের পরাজয় একেবারে অনিবার্য। জাতিসংঘ যখন হস্তক্ষেপ করলো না তখন তারা একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালালো যাতে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তারা আমাদের ঘাঁটি, পজিশন ও বেসগুলোর ওপর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা করে। সাথে সাথে তারা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাঞ্চলেও গোলাগুলি শুরু করে। আমাদের কাছে বিমান ছিলো না। তবে শেষের দিকে কয়েকটি বিমান নিয়ে ছোটখাট একটি বিমানবাহিনী গঠন করে ছিলাম। আমি যে বিমান পেয়েছিলাম তা ছিলো দু'টো হেলিকপ্টার, একটি অটার এবং আমার যানবাহন স্বরূপ একটি ডাকোটা। সেই অটার ও হেলিকপ্টারগুলোতে মেশিনগান লাগিয়ে যথেষ্ট সজ্জিত করা হলো। আমাদের যেসব বৈমানিক স্থলযুদ্ধে রত ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে একটি ছোট বিমানবাহিনী গঠন করা হলো। এই বাহিনীর কৌশল ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটি হামলা করা এবং ইন্টারডিকশন অর্থাৎ যোগাযোগের পথকে বন্ধ করে দেবার জন্যে লক্ষবস্তুর ওপর আঘাত হানা। শত্রুর ওপর প্রথম যে বিমান হামলা হয়েছে তা বাংলাদেশের বীর বৈমানিকেরা করেছে। ২৬ মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ হয়েছে তাতে যদিও আমাদের কাছে ছিলো না কিন্তু আমরা বিমান ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হেনেছি। শেষের দিকে একজন মুক্তিযোদ্ধা সিলেট বিমান ঘাঁটিতে একটি সি-১৩০ বিমানের ওপর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মেশিনগান চালায়। মেশিনগানের গুলিতে যদিও সি-১৩০ বিমানটি পড়ে যায়নি, তবে কোন রকমে ঢুলু ঢুলু করে চলে গিয়ে শমসেরনগরে নেমেছিলো এবং পরে অনেকদিন মেরামতে ছিল।

৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর রননীতি ও কৌশল কি ছিল এই প্রশ্নের জবাবে ওসমানি বলেন–

শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বরের আগে শেষ পর্যায়ে শত্রুবাহিনী ভারতের উপর যথেষ্ট পরিমাণ হামলা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে ভারতীয়দের যুদ্ধে নামতে হবে যদিও উপর থেকে তারা তখনো নির্দেশ পাননি। এমন কি শেষের দিকে যখন যশোর সীমান্তে ভারতের উপর হামলা হয়েছে উপর থেকে ক্লিয়ারেন্স আসেনি।

একদিনের কথা আমার মনে পড়েছে। সেই অঞ্চলে যুদ্ধরত আমার মুক্তি বাহিনীর উপর পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক আক্রমণ হচ্ছে। আমাদের কাছে ট্যাঙ্ক ছিলো না। পাকিস্তানী ট্যাঙ্কগুলো ভারতীয় অঞ্চলের উপরও গোলাবর্ষণ করছে। আমি তখন ওদের জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এর জবাব দিচ্ছেন না কেন? তারা বললেন, 'পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স, নেই।' তখন আমার নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর যোদ্ধারা অতি বীরত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করেছে। ভারতীয় বাহিনী ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধে নামে এবং শত্রু আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত ১৩ দিন যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য এর আগে তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনীর যখন যুদ্ধে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন আমরা সম্মিলিত ভাবে পরিকল্পনা করে একটি রণনীতি অবলম্বন করি। সেই নীতি ছিলো যেহেতু ভারতীয়দের কাছে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান রয়েছে সেজন্য যেখানে অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধ রয়েছে এবং বড় অস্ত্রশক্তি প্রয়োজন সেখানে তারা প্রথম লক্ষ্য দেবেন

এবং আমাদের বাহিনী শত্রুকে 'আউটফ্লাঙ্ক' অর্থাৎ শত্রুকে দু'পাশ দিয়ে অতিক্রম করে 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে ব্যূহের পার্শ্বভাবে আক্রমণ করবে অথবা ভারতীয়রা সামনের দিকে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং আমাদের বাহিনী 'আউটফ্লাঙ্ক' করে পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে। যেহেতু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনীর অভিজ্ঞতা ছিলো, আমার বাহিনী হাল্কা ছিলো ও ক্ষিপ্রতার সাথে রণাঙ্গনে চলাচল সক্ষম এবং যেহেতু অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ ছিলো সে জন্যে এই কাজগুলো করার দায়িত্ব ছিলো আমাদের উপর। যেখানে অধিক সংখ্যক গোলাবারুদ, বিমান বা ট্যাঙ্কের আক্রমণ করতে হবে সেখানে ভারতীয় বাহিনী শক্তি নিয়োগ করবে।

যেসব অঞ্চল কেবলমাত্র বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী মুক্ত করেছিলো। সেখানে আমাদের বাহিনী সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেন। আমাদের বাহিনী যেসব অঞ্চল এভাবে মুক্ত করে তার মধ্যে উত্তর বঙ্গের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চল, সিলেটের সুনামগঞ্জ ও দুতিক অঞ্চল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাঞ্চল চট্টগ্রামের করেরহাট হায়াকু, হাটহাজারী অঞ্চলের 'এক্সেস অব এডভান্স' কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল, যশোরের মনিরামপুর ও অভয়নগর অঞ্চল, খুলনার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কালিগঞ্জ অঞ্চল, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং ঢাকা পৌঁছার শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী, ঢাকা- এই 'এক্সেস অব এডভান্স' রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মিত্ররাও এই পদ্ধতিটি কার্যকর বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই পদ্ধতি ছিলো যেখানে পাকা বাঙ্কার বা রি-ইনফোর্সড কনক্রিটের শক্তিশালী ব্যূহ বা স্ট্রং পয়েন্ট রয়েছে সেখানে গিয়ে সরাসরি ঢু মারা বোকার কাজ এ ক্ষেত্রে যা করতে হবে তা ১৯৪২ সালে জাপানীরা বৃটিশ বাহিনকে (যাতে আমিও ছিলাম) শিখিয়েছিলো। এক্ষেত্রে সামনে দিয়ে শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং তাকে 'আউটফ্লাঙ্ক' করে ওর পেছনে গিয়ে স্ট্রং পয়েন্ট বানিয়ে বসুন। সে যাবে কোথায় এবং ওর 'রি-ইনফোর্সমেন্ট ও গোলাবারুদ; রসদ ইত্যাদি আসবে কোথেকে? এইভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার ব্যূহের পেছনে ও পার্শ্বভাবে আঘাত করুন। প্রথম প্রথম মিত্রদের অনেকে ভাবতেন আমরা কি ভীতু নাকি! তারপর একটি অভিজ্ঞতা হওয়ার পর বুঝলেন যে আমাদের পদ্ধতিই কার্যকর রণপদ্ধতি। এইভাবে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেবল একটি ব্যাটালিয়ন শত্রুর ১৪নং ডিভিশনকে আশুগঞ্জের যুদ্ধের পর ঘেরাও করে অকেজো করে দেয়।

তাই যেসব অঞ্চলে আমরা একা যুদ্ধ করেছি সেখানে আমাদের পদ্ধতি ছিলো, শত্রু শক্তিশালী ঘাঁটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সম্মুখভাগে ব্যস্ত রেখে তাকে 'আউটফ্লাঙ্ক' করে পেছনে গিয়ে বসা এবং তারপর পার্শ্বভাগ ও পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করা। অভ্যন্তর ভাগের গেরিলাদের ও আমাদের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণের সামঞ্জস্য বিধান করা। নির্দেশ থাকতো, গেরিলারা যখন অমুক জায়গায় আক্রমণ করবে তখন দৃষ্টিকে অন্যদিকে ধাবিত করতে হবে এবং শত্রু যাতে গোলাগুলি ও রি-ইনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করবে। গেরিলারা অমুক জায়গায় অমুক পুলটি উড়াবেন। তবে আমরা বড় বড় পুলগুলোতে হাত দিইনি। সেই পুলগুলো শত্রুরাই আত্মসমর্পণের আগে ভেঙেছিলো। যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি সেখানে কৌশল ছিলো, যেখানে অধিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেবে, 'এক্সেস

অব এডভান্স' এ ভারত শত্রুর স্টং পয়েন্টের উপর চাপ প্রয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ বাহিনী 'আউট ফ্ল্যাঙ্ক' করে গিয়ে পার্শ্বভাগে বা পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও সুস্পষ্ট নীতি ছিলো যে স্ট্র পয়েন্টগুলো 'ক্লিয়ার' করার পরবর্তী পর্যায়ে শত্রুর অন্য পজিশনগুলো আয়ত্ব করতে হবে, সেখানে, মুক্তিবাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এগোবে। তাঁদের অভিযানে ভারতীয় গোলান্দাজ বাহিনী যতোটুকু সাপোর্ট দেয়ার ঠিক ততোটুকু দেবে।

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যখন একসঙ্গে এগোতো তখন অগ্রগামী দল হিসেবে মুক্তি বাহিনী যেত এবং সাপোর্ট দিত ভারতীয় মিত্র বাহিনী—এই প্রশ্নের উত্তরে ওসমানি বললেনঃ সেটা হয়েছে প্রথম 'স্টং পয়েন্টটি ক্লিয়ার করার পরে। মনে করুন, শত্রুর খুব শক্তিশালী একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাটির উপর ভারতীয় বাহিনী ট্যাঙ্ক, কামান দিয়ে হামলা করতো। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনী 'ক্রস কান্ট্রি' দিয়ে গিয়ে 'আউটফ্ল্যাঙ্ক' করতো। ক্রস কান্ট্রি এগিয়ে যাওয়ার বিশেষ দক্ষতা মুক্তিবাহিনীর ছিল। এর দুটো কারণ ছিল—প্রথমতঃ আমরা ন'মাস নিজের অঞ্চলে যুদ্ধ করে আসছি এবং আমাদের বাহিনী তুলনায় হাল্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সংযোগ ছিল স্থানীয় লোকের সাথে, আমাদের প্রতি তাদের ছিলো পুরো সমর্থন। সেজন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে আউটফ্ল্যাঙ্ক করে শত্রুর পার্শ্বভাগ ও পেছন থেকে আক্রমণ করতাম যাতে সে আর টিকতে না পারে। যখন অগ্রবর্তী অন্যান্য শত্রু পজিশন আক্রমণ করতে হতো তখন আমাদের বাহিনী অগ্রসর হতো ও আক্রমণ করতো, কারণ অঞ্চলের পথঘাটগুলো আমাদের জানা ছিল, শত্রুর পজিশন সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের খবর আমাদের জানা থাকতো এবং গেরিলাদের সাথে আমাদের সমন্বয় ও সংযোগ ছিল। আবার এখানেও প্রয়োজন হলে ভারতীয় বাহিনী আমাদেরকে আর্টিলারী বা ভারী কামানের দ্বারা সাপোর্ট দিত।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে মোট কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং হেড কোয়ার্টার কোথায় ছিল এ প্রশ্নের উত্তরে জনাব ওসমানি বলেন,

বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেছিলাম। ১১টি সেক্টর একেকজন অধিনায়কের অধীনে ছিল। প্রত্যেক অধিনায়কের একটি সেকটর হেডকোয়ার্টার ছিল। এই সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলি বাংলাদেশের ভেতরেই ছিল। এই সেক্টরগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা যুদ্ধে লড়েছি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা 'থিয়েটার' অর্থাৎ দেশব্যাপী রণক্ষেত্রে যার ১১টি সেক্টরের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নদীনালা ও ব্যাপক দূরত্ব কেন্দ্রভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত পরিমাণ অফিসার ও স্টাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ছিল মাত্র ১০ জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনীর রণ পরিচালনার হেডকোর্টার। এছাড়া, এতবড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন আদেশ, নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা ও সে অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা আমাদের তখনকার পরিস্থিতিতে শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও ছিল। তাই আমি আমার চীফ অব স্টাফ ও অন্যান্য কমাণ্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন এবং আমাদের ও শত্রুর কাছে কার্যক্রমের কোন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরি। আমাদের সামরিক লক্ষ্য ও সে লক্ষ অর্জনের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা

সম্পর্কিত আমার নির্দেশের (অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশন ও অপারেশনাল ডাইরেকটিভ) মাধ্যমে সাধারণভাবে আমাদের বাহিনীর করণীয়, প্রত্যেক সেক্টরে তাদের বিশেষ করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধণ এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে জানতাম। আমার এইসব নির্দেশের প্রিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি সেক্টর কমাণ্ডারের স্থানীয়ভাবে তাঁদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সেক্টর কমাণ্ডারদের সাথে আমি লিয়াজো অফিসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এছাড়া আমার কমাণ্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে যেতাম অন্য সেক্টরে। আমি যখন যে সেক্টরে থাকতাম, সে সেক্টরের হেডকোয়ার্টারই হতো আমার হেডকোয়ার্টার। এভাবে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতাম ও সে অনুযায়ী নির্দেশ দিতাম। এছাড়া যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভাকেও আমি যুদ্ধের অগ্রগতি ও সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত রাখতাম।

যখন বাংলাদেশ সরকার আমাকে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন তখন আমি তাদের অনুমোদনে লেঃকর্ণেল এম এ রবকে চীফ অব ষ্টাফ নিয়োগ করি। তিনি আমার পরে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন।

বিভিন্ন সেক্টরের কমাণ্ডার নিয়োগ (১) এক নম্বর প্রথম মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিক (২) দুই নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ, পরে তিনি যখন 'কে' ফোর্স এর কমাণ্ডার হয়ে যান তখন বেশ কিছুদিন তিনি দুটোই কমাণ্ড করছিলেন, তিনি আহত হওয়ার পরে মেজর আবু সালেক চৌধুরী কমাণ্ড করেন 'কে' ফোর্স এবং ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দার। (৩) তিন নম্বর সেক্টরের কমাণ্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর শফিউল্লাহ, পরে যখন তিনি 'এস' ফোর্সের কমাণ্ডার হয়ে যান তখন মেজর নুরুজ্জামান (জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডাইরেক্টর)–তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। (৪) চার নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, যিনি সকল নিয়মিত অফিসার যারা চাকুরীতে রয়েছেন তাদের সকলের মধ্যে সিনিয়র। (৫) পাঁচ নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী, যিনি যুদ্ধের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধ করেন। (৬) ছয় নম্বর সেক্টরে ছিলে উইং কমাণ্ডার বাশার, তিনি বৈমানিক কিন্তু স্থলে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেণ। (৭) সাত নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর কাজী নুরুজ্জামান। তিনি পেনশনে ছিলেন ও আমার মতো যুদ্ধাবস্থায় এ্যাকটিভ লিস্টে কাজে যোগদান করেছিলেন। (৮) আট নম্বর সেক্টরের শুরুতে কমাণ্ডার ছিলেন মেজর ওসমান চৌধুরী এবং আগষ্ট মাস থেকে মেজর মনজুর। (৯) নয় নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ছিলেন প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত মেজর এম এ, জলিল। তারপরে ছিলেন মেজর জয়নাল আবেদীন। (১০) দশ নম্বর সেক্টর (নৌ কমাণ্ডো সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও আভ্যন্তরীণ নৌপথ) এতে নৌকমাণ্ডোরা বিভিন্ন সেক্টরে নির্দিষ্ট মিশনে সংশ্লিষ্ট কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করতেন। (১১) এগারো নম্বর সেক্টরে ছিলেন মেজর আবু তাহের, এছাড়া, তিনটি ব্রিগেড ফোর্স–জেড ফোর্স, কে ফোর্স ও এস ফোর্স কমাণ্ডার ছিলেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ ও শফিউল্লাহ।

হেডকোয়ার্টারে ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকার। চীফ অব ষ্টাফ রব সাহেব পূর্বাঞ্চলে থাকতেন। ওখানে আমার হেডকোয়ার্টারের একটি অংশ ছিল।

ওখানে যতগুলো সমস্যা প্রশাসন ও রণপরিচালনা সম্পর্কিত তিনি সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং যেটা নীতি গ্রহণ সম্পর্কিত হত সে বিষয়ে আমার নির্দেশ চাওয়া হত।
স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কতছিল এবং তারা কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো এবং গণবাহিনীর সেই সংখ্যা কত দাড়িয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তরে জনাব ওসমানি বলেন–
নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা বাড়াতে বেগ পেতে হয়েছিল। অস্ত্র নিয়ে বেগ পেতে হতো। বেশীর ভাগ সময় সকলের সদিচ্ছা থাকলেও অনেক জিনিস আমরা পেতাম না। আমার চেষ্টা ও চিন্তা এই ছিল যে, আমি বিভিন্ন অস্ত্র কত তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে পারি। কারণ ভারতীয়রা যদি তেসরা ডিসেম্বর যুদ্ধে না নামতো তাহলে তখন যে পরিস্থিতি ছিল তাতে আমাকে আরো ছয় মাস যুদ্ধ করতে হতো। এতে দেশের আরো অনেক ক্ষতি হত। এজন্য শত্রুকে আরও দ্রুত ধ্বংস করার জন্য অনেকগুলো অস্ত্রের আমাদের প্রয়োজন ছিল। সর্বশেষ একটি দেশের সাথে আমার সংযোগ হয়েছিল। সেই দেশটি তখনই অস্ত্র দিতে প্রস্তুত ছিল যদি আমার নিজের বিমান ঘাঁটি থাকতো। সে জন্যে আমি জেড ফোর্সকে সিলেট পাঠিয়েছিলাম। অনেকে জানতেন না হঠাৎ কেন জেড ফোর্সকে সিলেটের উপর চাপালাম। তারা কেবলমাত্র স্ট্র্যাটেজিক কারণই জানতেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটো, বিমানঘাটি যত তাড়াতাড়ি পাই তত তাড়াতাড়ি আমি হয়তো অনেক জিনিস সরাসরি আনতে সক্ষম হবো। এছাড়া শত্রুর শক্তিকে অন্যদিকে আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল। যাহোক, যুদ্ধের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব মনে হত না। কিন্তু আমার মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও অধিনায়কদের চেষ্টায় আমি যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ হাজার সৈন্য সম্বলিত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলেছিলাম। তারা সাধারণ ইনফ্যানট্রি অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। দুটো গোলন্দাজ ব্যাটারী আমরা গড়ে তুলেছিলাম। ভারতীয়দের প্রাচীন কিছু কামান ছিল। ওগুলো দিয়ে প্রথম ব্যাটারীটি গড়ে উঠেছিল। ওর নাম দিয়েছিলাম 'নম্বর ওয়ান মুজিব ব্যাটারী'। এই ব্যাটারী যুদ্ধেও ছিল। এর পরে আমরা দ্বিতীয় ব্যাটারী গঠন করি। আগেরটির চেয়ে একটু ভাল কামান দিয়ে এটি সজ্জিত ছিল। এ ব্যাটারীও যুদ্ধ করে।
আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি প্রায় ৫টি ব্যাটালিয়ন সৈন্য দিয়ে। যুদ্ধের শুরুতেই অনেকগুলোর সংখ্যা পূরণ করতে হয়েছে। যেমন, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ান একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুরোনো পল্টন। মাত্র ১৮৮ জনকে আমি পেয়েছিলাম। বাকীরা নিহত কিংবা আহত হয়েছিলেন যশোরের যুদ্ধে। তাদের সংখ্যা পুরণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ৫টি ব্যাটালিয়ান থেকে ৮টি ব্যাটালিয়নে উন্নিত করি। এগুলো ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক, দুই, তিন, চার আট, নয়, দশ এগারো নং ব্যাটালিয়ান। নয়, দশ, এগারো নং ছিল নতুন। এ ছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তুলি। সেক্টর ট্রুপস–এর সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ছিল দশ হাজার। যারা প্রাক্তন ইপিআর এবং নিয়মিত বাহিনীর বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে ১১টি সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর ট্রুপস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোন সেক্টরে চারটি কোম্পানী কোন সেক্টরে পাঁচটি কোম্পানী কোন সেক্টরে দুটি কোম্পানী এমনি বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন অনুসারে সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। তারা সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে যুদ্ধ করতেন।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে যে অর্গানাইজেশন ছিল আমরা তার পরিবর্তন করিনি। এই

অর্গানাইজেশন অনেক চিন্তা করে বিগত দশ বছরে শান্তি ও যুদ্ধে পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়া হয়েছিল, এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম সেটা ভারতীয় অর্গানাইজেশনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। আমি মনে করি আমাদেরটা সুষ্ঠু সেই অর্গানাইজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ব্যাটালিয়নগুলোর সাধারণ অস্ত্রসজ্জা ছিল। অন্যান্য দেশের ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়ানের যা সাধারণ অস্ত্র থাকে এখানেও তাই ছিল তবে ফায়ার পাওয়ারটা এই অর্গানাইজেশনের কিছুটা বেশী। যেমন, সাধারণতঃ একটি সেকশনে একটি লাইট মেশিনগান থাকে, আমাদের ছিলো দুটো মেশিনগান। আর অস্ত্র ছিল যা স্বাভাবিক ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নে থাকে-গ্রেনেড, রাইফেল, লাইট মেশিনগান, মিডিয়াম মেশিনগান, দুই ইঞ্চি এবং তিন ইঞ্চি বা ৮১ মিলিমিটার মর্টার এবং ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান। সেক্টর ট্রুপস-এর অস্ত্রও প্রায় এ ধরনের ছিল। তবে ওদের স্কেল ছিল আলাদা ওদের কাজ ঠিক নিয়মিত বাহিনীর মত ছিল না। তাদের ভূমিকা ছিল প্রথমে তারা ঘাঁটি করবেন। সেই ঘাঁটি থেকে গেরিলা ভেতরে পাঠানো হবে এবং গেরিলাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর উপর বিভিন্ন হামলা ও অন্যান্য কাজ করবেন। তাই তাদের অস্ত্রের পরিমাণ বা স্কেল এ্যাকটিভ ব্যাটালিয়নের চেয়ে কিছু কমও পৃথক ছিল।

এবার গণবাহিনীর কথায় আসছি। সর্বমোট প্রায় ৮০ হাজারের মতো ছিল গণ বাহিনীর সদস্য। আমি ৬০ থেকে ৭০ হাজার গণবাহিনী কাজে নিয়োগ করেছিলাম। এছাড়া কয়েক হাজার প্রশিক্ষণরত ছিল। এদের অস্ত্র যা দিতে চেয়েছিলাম, যে স্কেল আমরা তৈরী করেছিলাম ঠিক সেই পরিমাণ অস্ত্র সবসময় আমরা দিতে পারিনি। অস্ত্রের অভাবই ছিল এর কারণ। যাহোক, গণবাহিনীর বীর গেরিলাদের অস্ত্র ছিল প্রত্যেকের কাছে গ্রেনেড, কয়েকজনের কাছে স্টেনগান। এছাড়া ছিল রাইফেল, যদিও গেরিলাদের জন্যে রাইফেল সন্তোষজনক অস্ত্র নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের কাছে সবল ছিল না তাই যা পেতাম তাই ব্যবহার করতে হতো। এ ছাড়া ছিল অল্প কয়েকটি পিস্তলও এস এল আর। খালি হাতেও তারা যুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধরনের অপারেশনের জন্যে থাকতো বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক। নৌ কমান্ডোদের আত্মরক্ষার জন্যে হাল্কা অস্ত্র থাকতো, বেশীর ভাগ সময়ই গ্রেনেড। আর থাকতো অপারেশনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন লিম্পেট মাইন।

যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০-২৫ হাজার নিয়মিত বাহিনী এবং ৭০/৮০ হাজার গণবাহিনী।

গণবাহিনীর কেন্দ্র পৃথক সেক্টর ছিলকিনা এবং সি-ইন-সি স্পেশাল বাহিনী বা কাকে বলা হোত এ প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওসমানি বলেন-

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নাম ছিল মুক্তিবাহিনী। এর ভেতর স্থল, জল, বিমান, তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে মুক্তিবাহিনী শব্দে ভুল করেন। তারা মনে করেন শুধু গেরিলাদের বুঝি মুক্তিবাহিনী বলা হতো। আসলে তা নয়। বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর পুরোটা মিলিয়ে ছিল মুক্তিবাহিনী। এর দুটো অংশ ছিল- (১) নিয়মিত বাহিনী এবং (২) গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী। ভারতীয়রা এই শেষোক্ত অংশকে বলতেন এফ এফ অর্থাৎ 'ফ্রীডম ফাইটার'। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তো সবাই। আর গণবাহিনীর ও নিয়মিত বাহিনীর সেক্টর একই ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকারকারী সকলেই এই ১১টি সেক্টরের কোন না কোন একটি সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

সি-ইন-সি স্পেশাল সম্পর্কে এবার বলছি। শুরুতেই গেরিলাদের দু'সপ্তাহ ট্রেনিং দেয়া হতো। কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। পরে মেয়াদ খানিকটা বাড়ানো হলো তখন তিন সপ্তাহের মতো সাধারণ গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হতো। এ ছাড়া আমি কিছু সংখ্যক গেরিলার জন্যে একটি বিশেষ কোর্সের বন্দোবস্ত করেছিলাম। একে বলা হতো স্পেশাল কোর্স। ওটা ছয় সপ্তাহের ছিল। এই কোর্সে গেরিলা লীডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এবং গেরিলা ওয়ারফেয়ার অর্থাৎ শহরাঞ্চলে আবাসিক এলাকায় যুদ্ধ করার পদ্ধতিও তাদের শেখানো হতো। এদের ভূমিকা ছিল গেরিলাদের নায়কত্ব করা এবং সাধারণ গেরিলাদের দিয়ে সম্ভব নয় এমন সব কাজ সম্পন্ন করা। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল খুব কম। চাকুলিয়া নামে এক জায়গায় তাদের ট্রেনিং দেয়া হতো। এসব গেরিলারা বিশেষভাবে সিলেট হয়ে যেতো এবং এদের সিলেকশনের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি লোক নিয়োগ করেছিলাম। তাই এদের নাম কেউ কেউ বলতো সি-ইন-সি স্পেশাল। আসলে এ নামে কোন স্বতন্ত্র বাহিনী ছিল না।

যুদ্ধপরিচালনা ও নির্দেশনা সম্পর্কে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানি বলেন-

সরকার গঠনের আগে আমি সর্ব প্রথমে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছি মুখে বলে, যোগাযোগ করে তারপর আমি কমাণ্ডারদের আমাদের লক্ষ্য বা অবজেকটিভ এবং প্রত্যেক সেক্টরে কি ফলাফল অর্জন করতে হবে তা জানিয়েছি। এ জন্যে আমি সাধারণতঃ অপারেশনাল ইন্সট্রাকশন দিতাম। তাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিনায়কের উপর দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা হতো। সাধারণ লক্ষ্য এবং সেই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা এই হুকুমনামা বা ইন্সট্রাকশনে লেখা থাকতো। এ ছাড়া আমি একটি জিনিস ব্যবহার করেছিলাম যা নতুন ছিল এবং আমার জানা মতে এর আগে কোন সামরিক বাহিনীতে তা ব্যবহার করা হয়নি। সেটা ছিল-অপারেশনাল ডাইরেকটিভস-নির্দেশ এবং উপদেশ। পরিস্থিতি যাচাই ও বিবেচনা করে কি পরিমাণ এই ডাইরেকটিভস একজন অধিনায়ক অনুসরণ করবেন তা তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ তা না হলে আমরা যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারতাম না। তবে মৌলিক কয়েকটি বিষয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি। সব সময়ই মন্ত্রীসভাকে মাসে অন্তত একবার রণাঙ্গনের পরিস্থিতির মূল্যায়ন অবহিত করতাম। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভিত্তিক যে নির্দেশ মন্ত্রীসভা আমাকে দিতেন তা আমার অধিনায়কদের কাছে পৌঁছে দিতাম।

যুদ্ধকালিন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনারেল ওসমানি বলেন-

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু থেকেই আমরা ঘাঁটিগুলি গড়ে তুলেছিলাম। গণবাহিনী কাজ শুরু করার পর এই ঘাঁটিগুলি অধিকতর সক্রিয় হল। ঢাকা নগরীতেও কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। ঘাঁটি প্রায়ই পরিবর্তন করা হতো। কয়েকটি ঘাঁটি শত্রুর হাতে ধরাও পড়েছিল। ঘাঁটিগুলিতে যে কেবল মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা নয়, এতে আমাদের 'কনট্যাক্ট' এবং কোরিয়াররাও ছিলেন। একটা কোরিয়ার সার্ভিস পরিচালিত হতো। এদের সাথে ছিল ওয়ারলেস যোগাযোগ। কোরিয়ার-এর আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা হতো। কোরিয়ার-এর মাধ্যমে ভেতরের ঘাঁটিগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হতো। ঘাঁটি সাধারণতঃ তিন রকমের ছিল (১) যেখানে অস্ত্র জমা থাকতো, (২) যেখানে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হতো ও যেখান থেকে পাঠানো হতো এবং (৩) যেখান থেকে

শত্রুর উপর আক্রমন করার প্রস্তুতি নেয়া হতো। এছাড়া, ভেতরে অনেকে ছিলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে বাইরে না গিয়ে ভেতরে থেকে সহযোগিতা করেছেন।

জনগণের কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যেত সে সম্পর্কে তিনি বলেন বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে আন্তরিক ও অকুন্ঠ সমর্থন আমরা পেয়েছি-কেবলমাত্র গুটি কয়েক লোক ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ ২৬ মার্চ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। অনেক সময় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। এটা অবশ্য সত্য-যারা দালালী করেছেন-রাজাকার আলবদরদের যুদ্ধে অনেক জায়গায় পেয়েছি। তারা বর্শীর ভাগ সাহস সেখানে যুদ্ধ করতে দেখিয়েছে যেখানে তাদের মালিক পাঞ্জাবীরা ছিল, আর তা না হলে তারা মুক্তিবাহিনী দেখামাত্র পালিয়ে যেতো। তবে অনেক জায়গায় শত্রুর একটা প্লাটুন থাকতো আর একশো-দুশোজন রাজাকার, আলবদর হতো। জনগণের সাথে শুরু থেকেই যোগাযোগ ছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের সব সময় এমন মনে হতো যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে শ্বাস নিচ্ছে।

যুদ্ধকালিন সময়ে জেনারেল ওসমানি ঢাকায় এসেছিলেন কিনা তার জবাবে তিনি বলেন-অনেকে বলেছেন আমি ঢাকায় এসেছিলাম সেটা ঠিক নয়। আমি অন্যান্য অঞ্চলে এসেছি ও ঘুরেছি। কিন্তু ঢাকায় আসিনি এবং ঢাকায় আসা ঠিক সম্ভবপর ছিল না। আরেকটি কথা জনগণের সমর্থনের প্রসঙ্গে আমি বলছি। যোগাযোগ আমাদের সব জায়গায় ছিল সশরীরে-সব জায়গায়, সব শহরে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, অমুক তারিখে হাজির হতে হবে বলে টিক্কা খান আমাকে যখন সমন দিলেন তখন তার জওয়াব আমি দিয়েছিলাম। সেই জওয়াব টিক্কা খানকে পৌঁছানো হয়। আমার হাতের লেখা জওয়াব। টিক্কা খানের বাড়ীর দেয়ালে একটি বালক গিয়ে সেই জওয়াবের কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন সেই কাগজ নাকি কেউ টিক্কা খানকে দেখাবার পর সে বলেছিল হ্যাঁ এটি ঐ— এর হাতের লেখা। জেনারেল ওসমানী সাক্ষাৎকারে প্রবাসী বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীদের মেডিক্যাল সমিতির চিকিৎসা সাহায্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামরিক হাসপাতালসমূহের চিকিৎসাও সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভারতীয় জনগণের ও সরকারের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা জানান। তিনি বলেন, তাদের অবদানের কথা ভুলবার নয়।

দুশো বছরের ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতালাভের পর বাংগালীরা ভেবেছিল নিজেদের ভাগ্য স্বহস্তে গড়ার সুযোগ তারা এবার পেল। কিন্তু দুটি ভাষা ও ভৌগলিক অংশের একত্রি করনের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক তথাকথিত রাষ্ট্রের জন্ম ছিল একটি অস্থায়ী রাষ্ট্রের স্থায়ী বিরোধের ভিত্তিক্ষেত্র বা ইংরেজগণ বিতাড়িত হবার প্রতিশোধ হিসেবে তৈরী করে গিয়েছিল।

অবাংগালী পশ্চিমাদের সংগে বাংগালীদের কোন ক্রমেই যে একত্রে বসবাস করা সম্ভবনয় তা বোঝাগেলো মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে। উর্দু ভাষী পশ্চিমা শাসকেরা চাইলো পূর্বাঞ্চলকে তাদের তাবেদারীর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই বাংলা ভাষা ও তার ইতিহাস ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে সেক্ষেত্রে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করা। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংগালীদের সংগে শুরু হোল প্রথম মতবিরোধ। সেই থেকে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাদের সংগে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংগালীদের সংগে মত বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শুরুহোল পরবর্তী আন্দোলন ৬৮-৬৯ এর অসহযোগ আর ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান। ফলে এলো ৭০ এর নির্বাচন। বাংগালীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও ক্ষমতাপেল না। অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে এবার তারা বেছে নিল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ।

৭ই মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। বংগবন্ধুর নেতৃত্বে বাংগালীরা হোল ঐক্যবদ্ধ শপথ নিল মুক্ত মাতৃভুমি প্রতিষ্ঠায়। শুরু হোল মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করল ত্রিশ লক্ষ মানুষ, পুড়ল ঘর বাড়ী, বিনষ্ট হোল সম্পদ, ধ্বংস হোল রাস্তাঘাট, বিধ্বস্ত হোল দেশ। একাত্তরের লক্ষ লক্ষ শহীদদের মধ্যে যশোরের মাত্র কয়েকজন শহীদ বুদ্ধিজীবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হোল। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল দেশ মাতৃকার স্বার্থে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর আর আল সামস বাহিনীর হাতে।

মশিউর রহমানঃ বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও আইনজীবি মশিউর রহমান ১৯২০ সালে যশোরের সিংহঝুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এল ডিগ্রীলাভের পর যশোরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু তৎকালিন পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকারের সংগে মত বিরোধের কারণে চেয়ারম্যান পদে ইস্তফাদেন। এরপর ১৯৫২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যশোর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত দেশের ভাষা আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। সে জন্য তিনি দীর্ঘ দিন কারাবাস করেছেন। ১৯৫৩ থেকে ৬৬ সাল সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকা কালে ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের মনোনয়নে যশোর থেকে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পূর্ব বংগ সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার তাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ দিন কারাগারে অন্তরিন রাখে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে বংগবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুণরুজ্জীবিত হলে দল গঠনে তার অন্যতম প্রধান সহযোগী নিযুক্ত হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে যশোর থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫শে মার্চ ৭১ পাক বাহিনীর সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।

সিরাজুদ্দিন হোসেনঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের জন্ম ১৯২১ সালে যশোরের

মাওয়ায়। কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি এ পাশ করার পর দৈনিক আযাদে সাংবাদিকতা শুরু করেন। মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা আযাদে থেকেও তিনি ঐ সময় দেশের স্বার্থে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে মাওলানার সংগে তার মতবিরোধ শুরু হলে তিনি আযাদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ইত্তেফাকের মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অন্যতম সহযোগী হিসবে ইত্তেফাকে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ইত্তেফাকের উপর কঠোর জুলুম শুরু হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এক সময় ঐ পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে অত্যান্ত সাহসিকতার পরিচয় দেন। সাংবাদিক ইউনিয়নের জন্ম লগ্ন থেকে সহ-সভাপতি এবং পরবর্তী দুইবার সভাপতি ও পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদ সিরাজুদ্দিন হোসেন ১৯৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে কর্মক্ষেত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন যা স্বাধীনতার স্বপক্ষে একটি সাহসী দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিচিত। স্বাধীনতা অর্জনের শেষ পর্য্যায়ে ১০ ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর দোসর এদেশীয় আল বদর বাহিনীর লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।

শেখ আব্দুস সালামঃ ১৯৪০ সালে নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় শেখ আব্দুস সালামের জন্ম। নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং দৌলতপুর বি, এল, কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। তিনি নওগ্রাম ইউনাইটেড একাডেমী 'বেন্দা ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন' বড়দিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং শেষে কালিয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করেন। বহুমুখী প্রতিভায় সমুজ্জল আব্দুস সালাম রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যান্ত সুপরিচিতি ব্যক্তিত্ব। বংগবন্ধুর আদর্শ অনুসারী আবদুস সালাম ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের আগে স্বাধীনতার স্বপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কালে কারা বরণ করেন। '৭১ এ জেল থেকে মুক্ত হয়ে একদল যুবককে সংগে নিয়ে ভারতের পথে রওনা হন। পথিমধ্যে নড়াইলে রাজাকার বাহিনী তাদের আটক করে। এরপর অত্যান্ত অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে '৭১ এর ১৩ মে তাকে হত্যা করা হয়। কালিয়ার আবদুস সালাম মহাবিদ্যালয় তার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ এন এম মুনিরুজ্জামানঃ যশোরের কাচের কোল গ্রামে ১৯২৪ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুনিরুজ্জামানের জন্ম। নড়াইল হাই স্কুল থেকে ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস সি এবং বি এস সি অতঃপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ এ এম এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনীর প্রথম নৃশংস হামলায় তিনি নিহত হন।

অমল কৃষ্ণসোমঃ প্রখ্যাত নাট্য শিল্পী অমল কৃষ্ণ সোমের জন্ম যশোরের নড়াইলে। বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেতা হিসাবে সমগ্র পাকিস্তানে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০ থেকে '৭১ পর্যন্ত তার অভিনয় জীবনে মোট অভিনিত নাটকের সংখ্যা ১০০ এরও অধিক। প্রতিটি চরিত্রেই তিনি ছিলেন পারদর্শি। যশোর ইনষ্টিটিউট নাট্যসংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী ও অভিনেতা

অমল সোম ২৬ মার্চ '৭১ পাক বাহিনীর হাতে যশোরে নিহত হন।

শিকদার হেদায়েতুল ইসলামঃ নড়াইলের ইতনা গ্রামে ১৯৩৪ সালে হেদায়েতুল ইসলামের জন্ম। ১৯৫৪ সালে রাজঘাট উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং ১৯৫৫ সনে সেটেলমেন্ট বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকুরী ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। '৭১ এর ১৫ মে পাক বাহিনী ইতনা গ্রামে আক্রমন চালিয়ে প্রায় ১৫০ জন লোক কে হত্যা করে। এদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

মোঃ এলাহি বক্সঃ ঝিনাইদহের ভাদড়া গ্রামে ১৯২৮ সনে জন্ম। বিশিষ্ট সমাজ সেবক এলাহি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। লেখক হিসাবেও তার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। পাক সৈন্যারা '৭১ এর মে মাসে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

মনোরঞ্জনঃ জন্ম ঝিনাইদহের শৈলকূপায় ১৯০৭ সালে। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাক বাহিনী তাকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে হাত পা বেধে পানিতে ফেলে বর্বরচিত ভাবে গুলি করে হত্যা করে।

গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদঃ সমাজ সেবক হিসাবে পরিচিত মহিউদ্দিন আহমেদের জন্ম ঝিনাইদহের তায়না গ্রামে ১৯২১ সনে। রাজনীতি সচেতন জনাব মহিউদ্দিন স্বাধীনতার স্বপক্ষে কাজ করবার অপরাধে পাক বাহিনীর হাতে ৭ মে ১৯৭১ নিহত হন।

সুধীর কুমার ঘোষঃ যশোর শহরের বেজপাড়ায় ১৯১৫ সালে জন্ম। সনাতন ধর্ম ও শরীর চর্চাবিষয়ে তার যথেষ্ঠ অবদান রয়েছে। একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। যশোর মহিলা কলেজ, সিটি কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন। ২৮ মার্চ '৭১ পাক হানাদার বাহিনী তার পুত্রসহ তাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে অমানবিক অত্যাচার করে হত্যা করে।

শেখ হাবিবুর রহমানঃ সাংবাদিক ও ঝিনাইদাহ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাবিবুর রহমান ১৯১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১ মে '৭১ পাক সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে কঠোর নির্যাতনের পর ৯ মে হত্যা করে।

মায়াময় ব্যানার্জীঃ ঝিনাইদহের বড়িখালিতে ১৯১৮ সালে জন্ম। ব্যাকরনে কাব্যতীর্থ মায়াময় ব্যানার্জী মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত নিযুক্ত ছিলেন। ১ মে এপ্রিল '৭১ পাক বাহিনী স্কুল শেষে ফেরার পথে তাকে নির্মম ভাবে গুলি করে হত্যা করে।

মাসুকুর রহমানঃ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মাসুকুর রহমানের জন্ম ১৯৪২ সালে যশোরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পদার্থ বিদ্যা ও অংক শাস্ত্রে স্নাতক মাসুকুর রহমান ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এ কারণে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় ১৯৬৪ সালে কারাগার থেকে এম এস সি পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ কালে পাক বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন।

শামসুন্দোহাঃ ১৯৪৪ সালে ভারতের পশ্চিম বংগে জন্ম হলেও যশোরের ঝিনাইদহে তার স্থায়ী বসবাস ছিল। এ সময়ে তিনি কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। '৭১ এর ২০ এপ্রিল পাক সৈন্যরা তাকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে হত্যা করে।

লুৎফুন্নাহার হেলেনাঃ ১৯৪৭ সালে মাগুরায় জন্ম। মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। '৭১ এর আগষ্টে তাকে ধরে নিয়ে পাক সেনাদের সহযোগী দালালেরা দীর্ঘ দিন আটক রেখে নির্মম নির্যাতন শেষে হত্যা করে।

ইতিহাসে বর্ণবাদী আর আগ্রাসী রাজতন্ত্রের প্রভুত্ব বিস্তারী শাসক হিসেবে ইংরেজগণের অপনাম বিশ্বজোড়া। ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামক কোম্পানীর মাধ্যমে ব্যাবসায়িক অজুহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করে পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে দেশের ক্ষমতা দখলই ছিল ইংরেজ চরিত্রের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট। উপমহাদেশে এসেও তারা তাদের নিয়মিত চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটায়নি। এদেশীয় কতিপয় বিশ্বাস বিনাশীর সহযোগিতায় অবিভক্ত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে বংগদেশ তাদের শাসন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে। মূলতঃ তখন থেকেই এদেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হতে থাকে।

ইংরেজদের আগমনের কিছুকাল পর থেকেই তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে এদেশীয় মানুষ পর্যায়ক্রমে আন্দোলন শুরু করে। এসব আন্দোলনের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তে ভাগা সংগ্রাম, কৃষক সংগ্রাম এবং স্বদেশী আন্দোলনসহ অসহযোগ বিশেষ ভাবে খ্যাত। পর্য্যায়ক্রমে এমনি অসংখ্য গণ আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা এক সময় এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।

বৃটিশ সরকার অর্থাৎ ইংরেজ শাসকগণ এদেশ ত্যাগের আগে তাদের গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলাকে দ্বি-খন্ডিত করে তার পূর্বাঞ্চল যা আজকের বাংলাদেশ তাকে হাজার হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি অঞ্চলের-যে অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভাষা ভিন্ন বর্ণ অন্য এবং সংস্কৃতি আলাদা তার সংগে অংগীভূত করে পাকিস্তান নামক একটি অস্থায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে একটি স্থায়ী বিরোধের ক্ষেত্র তৈরী করে রেখে যায়।

পাকিস্তান নামক তথাকথিত সেই খন্ডকালিন প্রহসনের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ও বাংগালী জাতীর জীবনে শুরু হয় স্বাধীনতার নামে হাত বদলে মাধ্যমে নতুন বন্দি দশা। উগ্রসাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিকতাবাদী পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত এদেশে তাদের নির্যাতনের শাসন আর লুন্ঠনের শোষন কাল অব্যাহত রাখে। তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাংগালীরা নতুন করে স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার। প্রথমেই ভাষার প্রশ্নে উর্দু ভাষা পশ্চিমাদেশ সংগে মত বিরোধ শুরু হয় বাংলা ভাষী এদেশীয় মানুষের। প্রবল গণআন্দোলন আর দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোল বাংলাভাষা। কিন্তু এবার আর অধিনতা নয় স্বাধীনতা চাই।

১৯৭১ সালে বিশ্বের অন্যতম মহান মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বে বাংগালীরা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোরল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর তাই বাংলাদেশ ও বাংগালী জাতীর ইতিহাসে তাদের শ্রেষ্ঠতম সময় একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

একাত্তরের সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী দস্যুদের উৎখাত করতে জীবন উৎসর্গীত করেছিল লক্ষ লক্ষ বাংগালী। পরাধীনতার শিকল ছিড়তে সেদিন রক্ত ঝরাতে হয়েছিল

অনেক। সেদিনের সেই ভয়াল বিভিষিকাময় দিন গুলোর কথা মনে হলে স্তব্ধ হয়ে যায় সব কিছু। খণ্ড খণ্ড স্মৃতির বেদনায় এখনও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আজো প্রিয় হারা মানুষের অব্যাক্ত কান্নার মর্মভেদী আর্তনাদ করুন রোদনের মত বাজে। স্বাধীনতার ই-তিহাসে যে সকল সাহসী সন্তান তাদের অসিম সাহসীকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতীর স্বার্থে মৃত্যুকে বরণ করে অমর হয়ে রয়েছে—যাদের আত্মত্যাগে মহিমান্বিত এদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম যশোরের দুই সূর্য সন্তান নূর মোহাম্মদ সেখ আর হামিদুর রহমান, স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ খেতাব 'বীর শ্রেষ্ঠ' এ ভূষিত এই দুই মহান সৈনিক জীবনকে উৎসর্গ করে গেথে গিয়েছিল স্বাধীনতার মাইল ফলক।

নূর মোহাম্মদ সেখঃ ১৯৩৬ সালে নূর মোহাম্মদ সেখ যশোরের নড়াইলের মহেশখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। পিতা আমানত সেখ, মা জেনাতুন নেছা। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান হয়েও দারিদ্রতার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি নূর মোহাম্মদের।

১৯৫১ সালে ২৩ বছর বয়সে নূর মোহাম্মদ ভর্তি হোল তথাকথিত ইপি আর বাহিনীতে যা এখন বি ডি আর অর্থাৎ বাংলাদেশ রাইফেলস। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে পোষ্টিং হোল দিনাজপুরে। এরপর বদলী হয়ে আসে নিজের জেলা যশোর সেকটর হেড কোয়াটারে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। বাংগালীদের বুকে তখন উত্তাল সমুদ্রের গর্জন। বংগবন্ধু সেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিয়েছে স্বাধীনতার । মুক্তিকামি মানুষের আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে নগর থেকে গ্রামান্তরে। স্বাধীকার চেতনায় জেগে উঠে গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষ। সিপাহী নূর মোহাম্মদের সৈনিক মনকেও নাড়ালেয় স্বাধীনতা আর স্বদেশ প্রেমের ঢেউ।

২৫ মার্চ ১৯৭১ বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় কাপুরুষতা আর ঘৃণ্যতম হিংস্রতায় চিহ্নিত সময়। পাকিস্তানী দস্যুরা এ দিনের গভীর রাত্রির নিঃশব্দতাকে ভেংগে ঝাপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাংগালীদের উপর। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সিপাহী নূর মোহাম্মদের সচেতন বিবেকবোধ তাকে মুক্তি যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আট নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক জেনারেল মঞ্জুরের অধীন যশোর সীমান্তে নিয়োজিত হয় ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ সেখ। দীর্ঘ দিনের সামরিক অভিজ্ঞতা থাকায় একটি কোম্পানীর প্রধান নিযুক্ত করে যশোরের গোয়াল হাটি নামক স্থানে স্থায়ী টহলের দায়িত্ব দেওয়া হোল তাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১। নূর মোহাম্মদের সংগে দুইজন সহযোদ্ধা। সুটিপুর ঘাঁটির পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর নজর রাখার সার্বক্ষণিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে। অতন্দ্র পহরীর মত সতর্ক প্রহরা দিয়ে চলেছে তারা। চারিদিক পিন পতন শব্দহীন তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি আর অবস্থানের কথা এক সময় বুঝে ফেলে পাকিস্তানী দস্যুরা। শত্রুর নজরে পড়ে যায় ওরা তিনজন। চতুরদিক থেকে অবস্থান নেয় শত্রু সেনা সেই সংগে শুরু হয় মেশিন গান থেকে অবিরাম বর্ষণ। নূর মোহাম্মদ বুঝতে পারে জীবনের শেষ যুদ্ধের মুখোমুখি সে। অপর দিকে কিছুদূরে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরক্ষা ঘাঁটি জেনে গেছে তাদের টহল আক্রান্ত। নূর মোহাম্মদ আর তার দুই সহযোদ্ধাকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সবাই। কিন্তু নূর মোহাম্মদ ও তার দুই সহযোদ্ধা তখন চতুর্দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত। নূরমোহাম্মদের দুই সহযোদ্ধার অন্যতম সিপাহী নান্নু মিয়া। তার হাতে হালকা মেশিনগান এবং এটাই তাদের প্রধান অস্ত্র। গুলি ছুড়তে ছুড়তে পিছন ফিরতে থাকে ওরা। কি ভাবে মুল ঘাঁটিতে ফেরা যায়। এ সময় হঠাৎ করে একটা বুলেট নান্নু মিয়ার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নান্নু মিয়া এল এম জি

গড়িয়ে পড়ে হাত থেকে, সময় নেই শ্বাস রুদ্ধ কর মুহূর্ত, নিমেষে নিজের হাতে মেশিন গান তুলে নেয় নূর মোহাম্মদ। মনে পড়ে মাতৃভূমি রক্ষায় কঠিন দায়িত্বের কথা। সেই সংগে সহযোদ্ধাদের জীবন, কেননা দলীয় অধিনায়ক সে, সর্বত্মক চেষ্টা দিয়ে তাদের বাঁচানো তার দায়িত্ব। একহাতে কাঁধে তুলে নিল নান্নু কে অপর হাতের মেশিন গান থেকে বর্ষিত হচ্ছে অবিরাম বর্ষন। কি ভাবে সংগীদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরা যায়। এ অবস্থার মধ্যেও ঘন ঘন অবস্থান পাল্টে পাল্টে যুদ্ধ করে চলেছে সে যাতে করে শত্রুরা যেন বুঝতে না পারে কোন দিক থেকে কতজন মুক্তিযোদ্ধা তাদের সংগে লড়ছে। বিরামহীন ভাবে গুলি চালাতে চালাতে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ফিরতে থাকে ওরা তিন জন। এ সময় হঠাৎ একটি মর্টারের গোলা এসে নুর মোহাম্মদের ডান পা গুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। শেষ পরিণতির কথা জেনে গেছে সে। কিন্তু দমলে চলবে না, সহ যোদ্ধাদের প্রতি দায়িত্বের কথা এই মুহূর্তেও ভোলে নাই সে। তাদের বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা করে যেতে হবে তাকে।

নুর মোহাম্মদের দুই সহযোদ্ধার আরেকজন মোস্তফা, তার হাতে এল এম জি দিয়ে আদেশ দিলো অবস্থান পাল্টে গুলি ছুড়তে এবং সেই সংগে পিছন ফিরতে। আর সংগে নিতে বলে আহত নান্নুকে। মোস্তফার স্টেনগান তুলে নিল সে নিজ হাতে। শত্রুদের দ্রুত এগিয়ে আসা এভাবে ঠেকাতে থাকে সে যাতে করে মোস্তফা নান্নু কে সংগে করে মূল ঘাটিতে ফিরতে পারে। নেতার নির্দেশ এই মুহূর্তে ও সৈনিক মোস্তফা কঠোর ভাবে পালন করে যায়। নান্নু কে বুকে আঁকড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিরাপদে ফিরতে থাকে সে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সূর্য্য সন্তান মুক্তিযোদ্ধা ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন কোরল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সৈনিক জীবনের কঠিন কর্তব্যে বোধ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে। সহযোদ্ধাদের নিরাপদে না যাওয়া পর্যন্ত তার দুর্বল হওয়া চলবে না। কিন্তু অবিরাম রক্তক্ষরণ তাকে নিস্তেজ করে ফেলতে থাকে। তবুও স্টেনগান চলছে সমান ভাবে। নিজের জীবন দিয়েও যদি সহযোদ্ধাদের বাঁচানো যায়।

নুর মোহাম্মদের এই বিরল দৃষ্টান্তের আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছিল সেদিন। সহযোদ্ধা মোস্তফা নান্নুকে নিয়ে ঠিকই নিরাপদে ফিরতে পেরেছিল। শুধু ফিরে আসেনি নূর মোহাম্মদ। কিছুক্ষণ পর মুক্তি বাহিনী বিচ্ছিন্নস্থান থেকে সংগঠিত হয়ে শক্তিশালী আক্রমনের মাধ্যমে পাকিস্তানী দস্যুদের পিছু হঠাতে বাধ্য করে।

বন জংগলের মধ্যে পাওয়া গেল নুর মোহাম্মদের প্রাণহীন দেহটি। পাকিস্তানী হায়নারা তার দুটি চোখ উপড়ে ফেলেছে, বেয়োনেটের আঘাতে আঘাতে দেহকে করেছে ছিন্ন ভিন্ন। শত শত সহযোদ্ধার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। নূর মোহাম্মদের সহযোদ্ধারা একদিন দেশ স্বাধীন কোরল কিন্তু নুর মোহাম্মদ জেনে যেতে পারল না তার আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। নুর মোহাম্মদের স্মৃতি আজো তার সহযোদ্ধাদের বুকে গভীর নিশীথের করুন আর্তনাদের মত বাজে।

হামিদুর রহমানঃ ১৯৫৩ সালে যশোরের সীমান্তবর্তী গ্রাম খোরদা-খালিশপুরে জন্ম হামিদুর রহমানের। পিতা আক্কাজ আলী এবং মা কায়সুন্নেছার প্রথম সন্তান ঘরে আসে চরম অর্থকষ্টের মাঝে। কঠিন জীবন সংগ্রামের মাঝে কখনও কৃষি কাজ আবার কখনও রাজমিস্ত্রির জোগালে হিসেবে জীবিকা নির্বাহের কাজ চলতে থাকে।

১৯৭১ সাল। সমগ্র বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে গণআন্দোলনের ঢেউ। আর পরাধীনতা নয় এবার

স্বাধীনতা চাই সুতরাং পাকিস্তানীদের তাড়াও। বংগবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের অল্প কিছুদিন পূর্বে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে হামিদুর রহমান। ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টের সদস্য হিসেবে চট্টগ্রামে সবে শুরু হয়েছে তার প্রশিক্ষণ। এর মাঝে এলো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল রাত্রি। ইতিপূর্বেই সে জেনেছিল স্বাধীনতার জন্য বাংগালিরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। ২৫ মার্চ রাত্রে চট্টগ্রামের ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টের সদস্যরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে সেনা ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়। এই বিপ্লবী সৈন্য দলের অন্যতম সদস্য ছিলো হামিদুর রহমান। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর হামিদুর রহমানের ইউনিট সিলেট অঞ্চলে নিয়োজিত হয়। এখানেই এক প্রচন্ড যুদ্ধে জীবন দিয়ে মাতৃভূমি উদ্ধারের দায়িত্ব পালন করে গেল সে। সিলেটের শ্রী মংগল থানার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ধলই বিওপি। ভারতীয় সীমান্তের দূরত্ব এখান থেকে মাত্র কয়েকশ গজ। অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্থান যে ভাবেই হোক মুক্তিবাহিনীর দখল করা চাই। কিন্তু এখানে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনী। ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টের একটি শক্তিশালী ইউনিট কে দায়িত্ব দেওয়া হোল এই ঘাঁটি দখলের। এই ইউনিটেরই সদস্য ছিল হামিদুর রহমান।
২৮ অক্টোবর একাত্তর। ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার তখনও প্রকৃতির গায়ে গায়ে জড়ানো। দুর থেকে সব কিছু অস্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিল তিন দিক থেকে কিন্তু শত্রুর সঠিক অবস্থান কোথায় তা নিরুপন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় যার যার অবস্থানে অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিলেন অধিনায়ক লেঃ কাইয়ুম। অন্যদিকে হাবিলদার মকবুলকে বলা হোল গাছে উঠে শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণের। কিন্তু ততক্ষণে শত্রুরাজেনে গেছে মুক্তি বাহিনীর উপস্থিতির কথা। শুরু হোল শত্রু পক্ষের গোলা বর্ষণ। ইতিমধ্যে যোদ্ধারা চুড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ইউনিট প্রধান লেঃ কাউয়ুম বেতারে সাহায্য চাইলো গোলন্দাজ বাহিনীর। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগীতা পাওয়াগেল। মুক্তি বাহিনীর সহযোগি গোলন্দাজ বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমনে কেঁপে উঠতে থাকে সিলেট সীমান্তের ধলই বি ও পি। মুক্তি বাহিনীর নির্ভুল ও চুড়ান্ত আক্রমনের এক পর্যায়ে শত্রু ছাউনিতে আগুন লাগে যায় এতে ঘুরে যায় যুদ্ধে গতি। শত্রুসৈন্যরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের শেল, মর্টার মেশিনগান আর রকেট ল্যাঞ্চারের গগন বিদারী আওয়াজে চতুর্দিক প্রকম্পিত। একমাত্র লক্ষ্য পাকিস্তানী দস্যুদের সিমান্ত ঘাঁটি ধলই বি ও পি কেড়ে নেওয়া। কোন অবস্থাতেই পিছু হঠা চলবে না। সামনে অগ্রসর হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। ওদিকে শত্রুসেনারাও মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে।
যুদ্ধের এক পর্যায়ে মারাত্মক ভাবে হতাহত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। অধিনায়ক কাইয়ুম বেতারে যোগাযোগ করলো সেক্টর কমান্ডারের সংগে–জানালো পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা। অধিনায়কের নির্দেশ এলো কোন অবস্থাতেই পেছানো চলবে না। যে কোন ভাবে ঘাঁটি দখল করো। সহযোদ্ধাদের প্রতি একথা জানিয়ে লেঃ কাইয়ুম আক্রমনের ধারা আরো শক্তিশালী করে তোলার আদেশ দিলো। লক্ষ্য বস্তুর একেবারে সন্নিকটে পৌঁছে গেছে মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু কিছুতেই ঘাঁটির মূল অভ্যান্তরে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না। দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে বৃষ্টির মত মেশিন গানের গুলি ছুটছে। মুক্তিযোদ্ধারা চেষ্টা করে যাচ্ছে কি ভাবে ওটা নিষ্ক্রিয় করা যায়। অধিনায়ক লেঃ কাইয়ুম হামিদুর রহমানকে নির্দেশ দিলো পেছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ে মেশিন গান বন্ধ করো।

অধিনায়কের নির্দেশে সিপাহী হামিদুর রহমান যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ দায়িত্বটি পেয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হয়ে সে অতি সাবধানে এল এম জি, পোস্টের সন্নিকটে গড়িয়ে গড়িয়ে এগুতে থাকে। জীবনের সর্বশেষ আর কঠিন মুহূর্তে মুখোমুখি হামিদুর রহমান। এই মুহূর্তে নিজের জীবন কিংবা প্রিয়জন কোন দিকে তাকিয়ে বিপন্ন করা যাবে না অসংখ্য সহযোদ্ধার জীবন আর মুক্তিযুদ্ধের মহান ব্রত স্বাধীনতাকে। চোখের পলকে সে ঝাপিয়ে পড়ে এল এম জি পোস্টের উপর। মেশিন গান চালনায় নিয়োজিত দুই শত্রুসেনার সংগে শুরু হোল ধস্তাধস্তি। অবশেষে এক পর্যায়ে বন্ধ হোল শত্রুর মেশিন গান। মুক্তিযোদ্ধারা অধিকার কোরল সিলেট সিমান্তের গুরুত্বপুর্ণ স্থান ধলাই বর্ডার আউট পোষ্ট। হামিদুর রহমানের সহযোদ্ধারা দৌড়ে এলো ঘাঁটির মুল অভ্যন্তরে এল এম জি পোস্টের কাছে। নিরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সৈনিক হামিদুর রহমানের মৃত দেহ। পাশে অর্ধমৃত দুই শত্রুসেনা। হামিদুর রহমান জেনে যেতে পারলোনা তারই অসিম সাহসিকতায় দখল করা সম্ভব হোল ধলাই সিমান্ত ঘাঁটি। সহযোদ্ধারা তাকে পাশেই অবস্থিত আমবাসা নামক গ্রামের সমাধিতে শেষ অভিবাদন জানালো। একদিন দেশ স্বাধীন হোল মা অপেক্ষা করছে যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবার তার সন্তানের ঘরে ফেরার পালা। অবশেষে সেনাবাহিনীর চিঠিতে একদিন বৃদ্ধ জননী জানলেন ছেলে তার চির দিনের জন্য হারিয়েছে গেছে। কিন্তু তার জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৩ মার্চ '৭১। মুক্তিযোদ্ধে যশোরের প্রথম শহীদ চারুবালার লাশ নিয়ে সর্বস্তরের জনগণের মিছিল।

১ মার্চ '৭১। যশোরের সর্বস্তরের মহিলারা স্বাধীনতার দাবীতে মিছিল করছেন.

পাক সেনারা এভাবে হাত পা বেঁধে একজনকে নির্যাতন করছে। ছবিটি যশোর চাচড়া থেকে ৪ এপ্রিল '৭১ তোলা হয়।

যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যশোরের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল। ছবি ডিসেম্বর '৭১ তোলা।

৭১। যশোরের একটি বাঙ্গালী আবাসিক এলাকা পাকিস্তানী দস্যুরা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে।

১০ ডিসেম্বর '৭১। যশোরে কয়েকশ' বাঙ্গালীকে হত্যা করে এই কূপে জমা করা হয়

যশোর সেনানিবাসে একজন ধর্ষিতা মহিলার কংকালের পাশে ছায়া ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে
ছবি '৭১ ডিসেম্বর তোলা।

যশোর ডিসি বাংলোর দক্ষিণে একটি বাগান থেকে ছবিটি তোলা হয়. '৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর

যশোর চাচড়া সার গোডাউন বধ্য ভূমি থেকে উদ্ধার কৃত কংকাল। ৮ ডিসেম্বর '৭১–এর তোলা ছবি।

যশোর সেনা নিবাসের আখ খেতে ধর্ষিতা মহিলার কংকাল। পাশে সায়া/ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে।

অক্টোবর '৭১। যশোরে পাক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার একজন গৃহবধূ।

রাজাকার বাহিনীর নৃশংস শিকার যশোরের একজন বাঙালী গৃহবধূ।

১১ এপ্রিল '৭১। যশোরের ঝাজুরা লেবুতলা গ্রামে পাক বাহিনীর ধর্ষণের শিকার একজন গৃহবধু।

যশোরে একজন বাঙালী মহিলাকে পাক দস্যুরা ধর্ষণ শেষে এই ভাবে রেখে যায়।
ক'দিন পর তার গলিত দেহ শৃগালে ছিড়ে খায়।

পাকিস্তানীদের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর যশোরে বঙ্গবন্ধুর প্রথম আগমন। মাঝ খানে জেনারেল শফিউল্যা ও ডানে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মঞ্জুর।

যশোর সার্কিট হাউজে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করছেন (বা থেকে) লেখক আসাদুজ্জামান আসাদ, মুক্তিযোদ্ধা মোহাঃ সাফ ও ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম।